IBCA JAPAN

আগমনী ১৪২৯

Agomoni 2022

10th Edition দশম সংস্করণ

Publisher: India (Bengal) Cultural Association Japan

আগমনী 2022

By:

India (Bengal) Cultural Association Japan

Editing and Design:
Kaustav Bhattacharyya,
Bhaskar Dasgupta,
Pallab Sarkar,
Subhasis Pramanik

Front Cover Page: Dr. Nabarun Roy
Back Cover Page: Dr. Sukanya Misra

Previous publications by IBCAJ:

Agomoni 2021

Agomoni 2020

Agomoni 2019

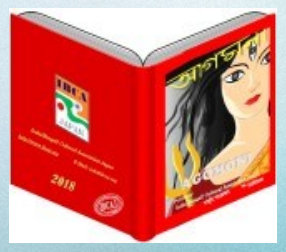
Agomoni 2018

Saraswat 2018

Agomoni 2017

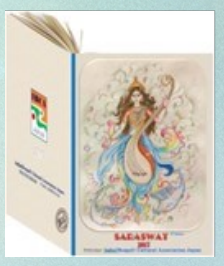
Saraswat 2017

Agomoni 2016

Saraswat 2016

Agomoni 2015

Saraswat 2015

Agomoni 2014

Saraswat 2014

Agomoni 2013

অনুষ্ঠান সূচী

পূজা : ১১টা ~
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান: ১২টা -১৩টা
প্রসাদ বিতরণ : ১৩টা - ১৪টা ৩০
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : ১৪টা ৩০ - ১৭টা
আরতি : ১৭টা - ১৮টা

Program

Puja: 11:00 onwards
Floral offering: 12.00 - 13.00
Lunch (Prasad offering): 13.00 - 14.30
Cultural Program: 14.30 – 17.00
Aarti: 17.00 – 18.00

সবারে করি আহ্বান

সম্পাদকীয়

কাটল রাত্রি। কাটল করোনা - কালরাত্রি। মুছল মলিনতা। ঘুচল আতঙ্কের প্রহর। ২০২০, ২০২১ এর বিভীষিকা পেরিয়ে আজ পৃথিবী ২০২২ এর নির্মল শরৎ আকাশের নীচে।

আজ শরৎ এর আলো আর শারদীয়ার সুর সবার হৃদয় জুড়ে। IBCAJ জেগে উঠল আবার নতুন উদ্যোমে — মাতৃ-আরাধনায়।

IBCAJ হল এমন এক প্রতিষ্ঠান যে ধারণ ক'রে রাখে তার কৃষ্টিকে, বহন ক'রে চলে তার ধারাবাহিকতা। তাই এখানে পালিত হয় নববর্ষ, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, বসন্তোৎসব, ইলিশ-উৎসব, শারোদৎসব, সারদা-আরাধনা প্রভৃতি রঙিন উৎসব। এক কথায়, মানুষের মিলনমেলারচনা করে IBCAJ নানান দৃষ্টিকোণে। ২০১২ সালে কিছু প্রবাসীর ঐকতানে শুরু হয়েছিল এর পথচলা।

এমনই এক অনুষ্ঠানের নাম শারোদৎসব যেখানে সনাতনীর সাথে মিশে যায় সাংস্কৃতিক আয়োজন—-সৃষ্টি হয় অভুতপূর্ব পরিবেশ। এখানে অনুষ্ঠান শুরু হয় মাতৃ-আরাধনা দিয়ে , মনের রিপু বলি দিয়ে, চলে পুষ্পাঞ্জলি সর্বশক্তিদায়িনীর পায়ে, আর শেষ হয় নান্দনিক সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে যা রচিত হয় IBCAJ এর ছোট বড় সবার সক্রিয় অংশগ্রহণে। হাজার ব্যস্ত জীবনের মাঝে এ এক নিখুঁত নিপুণতা।

এ বছর শারদ-বন্দনার একাদশ বর্ষা। মায়ের আবাহন এবছর মায়েরদের পৌরহিত্যে। নারীশক্তির হাতেই নারীজাগরণের ভার , IBCAJ পালন করবে এই গুরুভার।

জাপানের মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা আর সহৃদয় সহযোগিতা আমাদের পাথেয়। শুধু ভারত বা জাপান নয়, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের মানুষ মিশে যান এই মিলনমেলায়, সত্যই আমরা চাক্ষুষ করতে পারি,

"আনন্দধারা বহিছে ভুবনে"

পূজার পাশাপাশি শারদোর্ঘ্যের আর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ— আগমনী। এ বছর তার দশম বর্ষ। বিভিন্ন রঙের দৃষ্টি এখানে ধরা পড়ে তাদের কলম বা তুলির মধ্য দিয়ে;তারও শ্রীবৃদ্ধি কামনা রইল — আরো অনেক চিন্তাচিহ্ন সমৃদ্ধ করুক আমাদের প্রত্রিকাকে-এই প্রার্থণা রইল।

অন্তরে জেগে থাকা অন্তর্যামীর কাছে প্রর্থণা জানাই, এমন সুন্দর এই ভুবনে,

"মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।"

সবার সুস্থতা কামনা করি। সুন্দর হোক প্রতিটি জীবনের পথচলা, সার্থক হোক তাদের ব্রত—এই কামনা নিয়ে এগিয়ে যাক IBCAJ।

আপনাদের হাসি আমাদের হাতিয়ার।

भारत के राजदूत
AMBASSADOR OF INDIA

भारत का राजदूतावास
Embassy of India
2-2-11 Kudan Minami, Chiyoda-ku
Tokyo 102 0074

MESSAGE

It gives me immense pleasure to extend my congratulations to the India Bengali Cultural Association (IBCA) Japan for organizing the Durga Puja festival in Tokyo on 8th October 2022. It is noteworthy that IBCA has been at the forefront of organizing Durga Puja celebrations in Japan for the past 10 years.

2. The celebration of such festivals not only provides an opportunity to the younger generation of Indian Community to carry forward their traditions, but also provides an occasion to our Japanese friends to enjoy the culture of India. I firmly believe that such celebrations will go a long way in fostering deeper bonds between our people, contributing to further strengthening of India-Japan Special Strategic and Global Partnership.

3. I would also like to congratulate IBCA for bringing out their annual magazine "Agomoni" which is an excellent platform for literary expressions from the community.

4. On this auspicious occasion, I convey my best wishes to my fellow Indians and Japanese friends for their good health, prosperity and happiness.

4/10/22

(Sanjay Kumar Verma)

Tokyo
October 4, 2022

Telephone: +81-3-3265-5036 ; Fax: +81-3-3262-2301 ; E-mail: amb.tokyo@mea.gov.in ; amboffice.tokyo@mea.gov.in

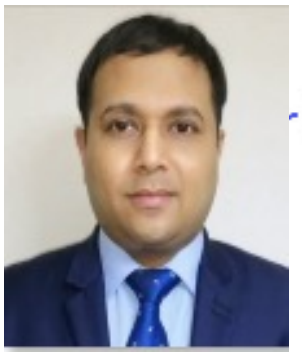

From the President's Desk

Dear Readers,

Another memorable year has just passed by after the publication of Agomani 2021, we all would have seen lot of ups & down in our own life, we all have given our extended support to family & friends and many others, we fought the tough time, we never given up, steadily we stood up. Finally, the time has come to celebrate yet another publication of Agomani 2022.

Tough time makes us stronger and taught us many lessons knowingly, unknowingly. We all have gone through the difficult time in 2020-2021, despite of this, we pledge to make 2022 more beautiful and memorable. India`s diversified culture plays a main role here and festivals fills the gap of ups & down in the life. Festivals brings all the communities together for better tomorrow & united India. Durga Puja is one of the main festivals not only for Bengalis but for the entire nation.

Like the last year, this year also we are going to celebrate Durga Puja in Tokyo. It was never an easy task. We are constantly in touch with the hall management, local government, Tokyo city Governor and following up each restriction, rules, dos, don'ts, etc. Truly, we have been getting ample of support from each of them and because of their kind support, finally we are very close to celebrate much awaited festival – Durga Puja on **08-Oct-2022**. Equally, we thank the ***Japan govt for their very successful vaccination drive***.

I would like to inform that all our IBCAJ members are vaccinated, and we are sure that our all guests also would have been vaccinated. Nevertheless, we will make sure that every single person should be verified through the temperate check, vaccination status, wearing mask all the time, usage of hand sanitizer, etc. before they actually come in and join us on this holy occasion of Durga Puja.

Like other previous years, this celebration of Durga Puja in Tokyo comes with the publication of much waited annual Magazine, **"AGOMONI".** Due to limited logistics and other restrictions, we are not able to publish the print version of this 10th edition, and only the web-version is made available to our readers. However, I must express my sincere thanks and gratitude to all Editorial members of *Agamani* and contributors for their hard work in making it possible to publish this magazine.

It's also an immense pleasure to note and convey to you all that every year we have some new members joining in our India(Bengali) Cultural Association Japan

(IBCAJ). Their fresh energies and enthusiasms help us to be more active, productive and remain strong & young in any given condition.
Finally, I would like to express my deepest gratitude to “The Indian Embassy to Japan” for their constant support and guidance. I would also like to thank all of our sponsors, for their cordial support and always being with us.
Last but not the least, on this auspicious occasion, Let us pray to Ma Durga for our good health, prosperity and for better tomorrow. **HAPPY DURGA PUJA** to all of you.

Naba Ghosh
President, IBCAJ

Contents

The Holy Goddess Durgā
Cyril Veliath S.J. 11

The significance of Rabindranath's first visit to Japan
Probir Bikash Sarker 13

কিছু কথা
শুভব্রত মুখার্জী 21

জালিয়ানওয়ালাবাগ - কেন ভারতীয়দের উপর ভারতীয়রা গুলি চালায়
তুহিন ঘোষ 26

আমার দেখা পুজোর রকমফের
মধুমিতা নাগ ঘোষ 29

অযথা ভেঙে পোড়োনা মা ... আমাদেরও ভেঙে পড়তে দিও না যেনো ...।
সৌরভ মজুমদার 32

দুর্গা পূজার পৌরাণিক উপাখ্যান এবং বাংলায় দুর্গা পূজার ইতিহাস
সুদিপ্ত সাহা 35

পৃথিবীর কিছু অদ্ভুত বাড়ি
সুদীপ্ত বর্মন 38

Art Section 1 42-46
Bipasha Dutta, Agnimitra Saha, Soumya Bhattacharjee, Poonam Mondal,
Soma Halder, Enakshi Misra, Dr. Sudipto Banerjee, Sukanya Misra

Art Section 2 71-74
Manami Das, Rishaan Das, Samaira Solanki, Sourik Bosu, Audity Bosu,
Aumisha Bosu, Antara Ghosh, Ananya Kothari, Shambhavi Solanki,
Shreyas Das, Srija Das,

Art Section 3 108-109
Diganta Banik, Anushka Pal, Soumi Roy, Dishita Biswas

Photography 85-90
Paromita Roy, Diganta Banik, Santanu Bose,
Debdutta Panigrahi, Kalyan Halder, Mousumi Biswas, Pratyusha Sarkar

Photostory 122
Ranit Chatterjee

বিশেষ প্রবন্ধ

আর্ট

ফটোগ্রাফি

Contents

কবিতাগুচ্ছ 47-55
সুব্রত সেনগুপ্ত, ভাস্কর দেব, প্রত্যূষাÊসরকার, অঞ্জন বর্মন, শ্রাবণী ঘোষ বসুমল্লিক, নূপুর মুখার্জি, সৌরভ দেবনাথ, শুভা দত্ত, শুভজিৎ মুখার্জী, নির্মলেন্দু গুণ, সুচেতনা, সুছন্দ চ্যাটার্জী, ख़ुशी वर्मा
Dr Sudipto Banerjee

Ethereal Eastern Experience – Japan East
Sugam Ghosh 58

শরতের পল্লী-জাপান
ঋতুপর্ণা চক্রবর্তী 68

অ্যাকর্ডিয়ন
অর্চিস্মিতা 75

বিলুপ্ত পাখিদের কলারটিউন
সৈকত ঘোষ 78

চেনা পথের বাঁকে
দীপশিখা পাল 79

চাঁদ
নূপুর মুখার্জি 81

বিচিত্র বর্ণপরিচয়
কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য 83

চৈতন্যোদয়
সুশান্ত ভট্টাচার্য 84

আদিম জানলা ও সমুদ্র পার্বণ
প্রত্যূষা সরকার 91

রঞ্জুদা ও গন্ধ অবিচার
ভাস্কর দাশগুপ্ত 94

বুড়ো আঙুল
সৌম্য দাশগুপ্ত 97

রাখে হরি মারে কে
পার্থপ্রতিম ব্যানার্জী 100

অয়েল পেন্টিং
এণাক্ষী মিশ্র 104

Recipe section

The kitchen tussles
Tanaya Mukherjee Dasgupta 110

Chicken Internet
Beas Dutta 112

肉じゃが　レシピ
若林　恵理 114

মালাই কোপ্তা,
মৌরলা মাছের বাটি চচ্চড়ি
মৌসুমী বিশ্বাস 115-116

পুজোর স্মৃতি আর নারকেল নাড়ু
চিত্রাঙ্গদা 117

Misc.

Tips for healthy eating and weight loss:
Sagarika Dey 119

一緒に幸せになろう!
阿久津睦代 121

Puzzle, Quiz

Crosswords for Juniors, Seniors
Subrata Kumar Dutta 56-57

Football World Cup Quiz
Subhasis Pramanik 107
[Answers 126]

The Holy Goddess Durgā

Cyril Veliath S.J.
Professor Emeritus
Sophia University, Tokyo, Japan

Although Durgā Puja is a festival of India, yet it is now known all over the world. According to an English scholar named G. Small, the Holy Goddess *Durgā* combines the characteristics of three eminent goddesses of ancient Greece, namely the goddesses *Minerva*, *Pallas*, and *Juno*. As consort of *Shiva* the Lord of destruction, and daughter of *Himavat*, she is known as *Mahadevi*, the great goddess. The Goddess *Durgā* appears in the *Mahabharat* with a wide diversity of names and many unique characteristics, but to truly gain an understanding of her personality we need to read the *Puranas,* and some later scriptural works. As *Shakti*, or the female energy of *Lord Shiva,* she is endowed with both a mild and fierce personality, and it is under the latter form that she is particularly known.

In her milder form she is at times referred to as *Umā*, which certain scholars translate as "light" or "beauty," as *Gauri* a word often translated as yellow or brilliant, as *Jagan-mātā*, or "mother of the world," or as *Bhavāni*, the "giver of life." In her fierce form the goddess symbolizes her hostility to sin and evil, and the name *Durgā* too is frequently translated as "secure" or "inaccessible." Other typical designations of the goddess are *Vindhya-vasini* or "the one dwelling in the Vindhyas," *Kanya-kumari* or "the youthful maiden," *Sinha-vāhinī* or "the one who rides a lion," and *Mahishasura-mardini* or "slayer of the buffalo demon." The *Mahabharat* states that the Goddess *Durgā* was worshiped by fierce tribes such as the Śabaras, Barbaras, and Pulindas. Her *vāhana* or mount is a lion or tiger, and she had eight demonesses called *yoginīs* who assisted her.

Regarding the origin of the name of the goddess, the *Skanda Purāna* gives the following account. The sage *Agastya* once asked *Kartikeya* as to why his mother was called *Durgā*. To this, *Kartikeya* replied, "a giant named Durga the son of Ruru, performed austerities and obtained the blessings of *Brahmā*. Because of this he grew enormously powerful, and so he conquered the three worlds and defeated *Indra* and the other gods. He then banished the gods from heaven and sent them to live in the forests, he forced the wives of the *Rishis* to sing his praises, and he got rid of religious ceremonies. As a result of this people could not read the *Vedas,* rivers changed their courses, fire lost its energy, and the stars disappeared. He then assumed the shape of clouds and made the rain fall wherever he pleased, and due to this the earth yielded an abundant harvest and plants began to flower, but fruits were produced out of season. The suffering gods then appealed to Lord *Shiva,* and Lord *Shiva* requested his wife Goddess *Mahadevi* to destroy the demon. *Mahadevi* summoned a gorgeous female warrior named *Kālarātri,* and ordered her to force the giant to restore things to

their original state, but although *Kālarātri* fought bravely, she was unable to subdue the giant. The giant then ordered his soldiers into the Vindhya mountains to overcome Goddess *Mahadevi*, but after a violent battle the goddess slew him. The gods who had witnessed the conflict were greatly thrilled, and since the giant's name was Durga, the goddess received the feminine form of the name and became *Durgā*." Slightly different versions of this account are found in the *Mārkandeya Purāna* and *Vāmana Purāna.*

The Goddess *Durgā* is basically a mother. As the Goddess *Parvati* she is a affectionate housewife and matriarch, who loves and protects mankind as a lioness protects its young ones. This love is revealed in a beautiful *Purānic* myth concerning her much-loved son the elephant-headed God *Ganesha,* who is also often referred to as *Ekadanta,* due to the fact that he is possessed of a single tusk. A close friend and committed disciple of *Shiva* was the warrior sage *Parashurama*, an incarnation of the Preserver God *Vishnu,* and the sworn enemy of all members of the *Kshatriya* or warrior caste of society. *Parashurama*, who was totally unaware of the birth of this new-born son of *Shiva* and *Parvati,* decided on an occasion to pay his master *Shiva* a visit. To his surprise however he found that his entry into the house was barred by *Ganesha,* since his parents were deep in slumber and *Ganesha* was anxious that they should not be disturbed. Annoyed at this unusual figure whom he had never set eyes on before, *Parashurama* insisted that his close relationship to *Shiva* entitled him to enter, but *Ganesha* was firm in his refusal. Totally unaccustomed to this type of treatment, *Parashurama* was instantly enraged, and so after a few heated words he challenged *Ganesha* to single combat. As the two combatants were more or less evenly matched, a terrible battle was in the offing. Nevertheless however, when *Parashurama* hurled his axe at the head of his opponent, *Ganesha* at once recognized it as his father's weapon (since it was *Shiva* who had originally gifted the axe to *Parashurama*). And so, with deep devotion and humility he stood with folded arms and received the axe on his tusk, as a result of which his tusk was instantly shattered. The sound of this fracas aroused *Shiva*, who came running out along with *Parvati,* and on seeing the two combatants, he instantly realized the situation. The sight of the shattered tusk of her dearly loved child evoked within *Parvati* a violent fury. She was about to discharge a curse on *Parashurama*, but as luck would have it *Vishnu* the Preserver God appeared in the form of the boy-god *Krishna* and succeeded in pacifying her, and thereby rescued *Parashurama* from a serious predicament.

These accounts from the *Mahabharat* and *Purānas* provide us an insight into the nature of the Goddess *Durgā.* She is not merely a warrior against sin and evil, a terrifying figure for demons and evil-doers, and the consort of the Lord *Shiva*. She is also a tender-hearted and loving mother, who keeps an eternal and watchful eye upon her many children.

The significance of Rabindranath's first visit to Japan

Probir Bikash Sarker

In 1916, Rabindranath Tagore first visited Japan. 2016 was the centenary of that trip. But there was not much discussion on the issue in Japan or India. It can be said that the year has passed in a kind of silence.

Rabindranath's first visit to Japan was a historic and important event not only in his life but also in India and in Asia. It is also deeply significant. Why is it significant? I don't know that this issue has been discussed at all. The main reason for not discussing it is that the history of "Tagore-Japan relations" still seems to be unknown.

It is no exaggeration to say that Bengalis and Indians are almost unknown about the five times that Rabindranath Tagore traveled to Japan and was greatly influenced by. On the other hand, the names of many Japanese who have been deeply influenced by his literature, painting, music, education, philosophy, patriotism, nationalism, naturalism, child education, religious thought, cosmopolitanism is also almost unknown. It can say that no other nation in the world has done so many works on Tagore in the past century as the Japanese have done. What are the actual reasons for this rare devotion that should be seriously researched?

It is my firm belief that two far-reaching significant events took place during Rabindranath's first visit which laid the foundation for "Tagore-Japan relations" and "India-Japan bilateral relations." The first incident is his acquaintance and closeness with a female university student named Wada Tomiko. In the second case, in 1915, the Indian revolutionary Rash Behari Bose, under the pseudonym PN Tagore (PriyaNath Tagore), fled to Japan and took refuge.

Relationship between Rabindranath and Tomi Koura:

Born in 1896, Tomiko Wada had been a devotee of Rabindranath Tagore since 1916 and did not forget Gurudev until her death. She met the most revered Gurudev a total of six times. Four times in Japan, once in America and once in Shantiniketan, India. She graduated from Japan Women's University and earned her Ph.D. degree from Columbia University in the United States in 1922 by researching the "Experimental Study of Hunger in its Relation to Activities." Her name was later changed to Tomiko Koura for marital reasons. Her husband was also a renowned psychiatrist and psychological writer Dr.Takehisa Koura (1899-1996).

However, she is known in Japan as Tomi Koura but not much nowadays.
Japan's first psychologist Dr.Tomi Koura was very proficient in English, later she became a professor at the Japan Women's University, and a leading figure in the international women's liberation movement, in the world peace movement, and a twice-elected member of the National Diet. Although originally a member of Minshutou or the Democratic Party, she was at the same time a communist, a pacifist, and an orientalist. In 1972, she was awarded the state's highest recognition, the "Kun Nitou Juihoushou" or "Orders of the Sacred Treasure", for her outstanding contributions to the country, the nation, and the international arena. She was also an honorary member of the "Imperial Rule Assistance Association" (1940-45), an influential organization. Rabindranath Tagore's relationship with such a large-scale personality is an exceptionally enlightening chapter in the cultural history of Japan-Bengal relations. From an interpreter, Mrs. Koura gradually became the translator of Tagore's works and the author of books on him. She has written many research articles, essays, and memoirs on Tagore's thoughts throughout her life. Two of these famous books are "Shintsuki, RabindoronathoTago-ru" or "New Moon, Rabindranath Tagore" (Apollonsha /1962) and "Shi to JinseiTago-ru" or "Poetry and Life of Tagore" (Apollonsha / 1967). It is unknown to me than any other foreign woman devotee who has researched and written many articles on Tagore. In this respect, no other foreign country can be compared to Tomi Koura, who is more Japanese than Tagore female enthusiasts.
She became so attached to Gurudev that she even named her new home "Shantiniketan", according to the commentary of Professor Kazuo Azuma, a leading Japanese Tagore researcher. It is noteworthy that the well-known author Yasuko Tsuge wrote in 1983 that her love for Rabindranath was so deep that: "Tomi Koura who met Rabindranath Tagore in course of events while she was a student at the Japan Women's University, has been moved to the left and right in a big way by his thoughts." ....." Listening to Tagore's speech for the first time at the university auditorium and spending time with him at the university's Karuizawa Learning Center in the summer of that year, made a deep sense of heartbeat within her. She would listen carefully to every word uttered by Rabindranath and noted it. Surprisingly, even at the age of 87, the memories of that time are still vivid in her mind: for example, after reading some of his poems by Rabindranath Tagore also recited by himself to show the melody for the experience of the students. Perhaps she was shaken by the poems that should be called Tagore's Immaculate Soul. Since then, his immense devotion to Rabindranath has remained unchanged till her death, and her personality, thoughts, and writings have been continuously introduced in Japan. In her biography, she writes that every time Rabindranath came to Japan, she was accompanied by his interpreter and went to India herself. And her current position is as president of the "Japan Tagore Association."

"It is difficult to explain in a single sentence the thoughts of Rabindranath that influenced her at that time." ..... "Rabindranath pointed out that war and aggression are at the center of Western nationalism, and that Japan, following it, has so far taken care of its nature and beauty and now is destroying its own traditional culture. This message Tomi Koura has been constantly presented to the Japanese people through translation into Japanese. Mrs. Koura learned to love nature from Rabindranath. He has given her oriental vision to build their own civilization by standing on their own tradition and culture to follow the way of life by uniting with nature. "[1]

It is also known from the commentary of the famous poet Rumiko Koura, daughter of Tomi Koura, that "Mother did not say much about India at home but always bought Indian clothes and Tagore's paintings as gifts. It is as if she has nurtured us in an international way." [2]

Gurudev Rabindranath, on the other hand, was so impressed by Tomi Koura's talent and work ethic that on March 27, 1929, he wrote a poem addressed to her:

"It is not a bower made white with the bunches of Jasmine.
It is waves swinging with the turbulent foam."

During the visit to the poet in India in 1935, he extended his steps to Shantiniketan and met Gurudev. Accepted short-term hospitality. Needless to say, both the master and the disciple were overjoyed to be reunited after such a long time.

Many years have passed since then. After the great destruction and bloodbath of the 2nd World War, the world and human society have changed radically. By that time, the poet Tagore has also left this world with a book of unrest and dissatisfaction--seeing the crisis of civilization. Without seeing the desired independence of subjugated India. Tomi Koura is saddened to see this change in the world with her own eyes, watching Asia burn in the fire of violence and revenge.

Undoubtedly, during the long war from 1941-45, she spent her gloomy time remembering Gurudev. The news of the death of the poet was known in the newspapers before the war. Without overcoming the mental shock The World War II started in December, four months after Gurudev's death.

In 1947, India achieved the adored independence of Gurudev Rabindranath Tagore. Like many other Tagore devotees, she was happy. After a couple of years, an unexpected opportunity came to her. Gurudev's birthplace, West Bengal in India, hosted the "World Peace Conference" in March 1949 at the invitation of Prime Minister Nehru, and she re-entered Shantiniketan. Where she remembered Gurudev deeply. She was one of the directors of the executive council of the "Tagore Memorial Association Japan", formed in 1958 to celebrate Rabindranath Tagore's 100th birth anniversary. She was invited to Calcutta to celebrate the centenary of the poet's birth and went again to India.

To commemorate the spatial memory of her first meeting with Rabindranath, a bronze bust commemorating the poet's 120th birth anniversary was erected a

Memorial statue in 1981 at the foothills of the Asama Mountains on the outskirts of the town of Karuizawa in Nagano Prefecture. At that time she was 85 years old. She Named the statue "Jinrui Fuchen" or "Warless Mankind" in honour of Rabindranath Tagore. In this context, she wrote in her autobiography: "..... I have set up this sculpture as the president of the Tagore Association with the help of the classmates of Japan Women's University. The alphabet Jinrui Fuchen is engraved on the chest of this sculpture. Rabindranath has appealed for a non-violent world all his life. Now we must hold fast to his word. It is not easy to prevent making money by killing people, to stop countless people trying to gain power. Greed for power is an evil force that is deeply rooted in humanity. This is not to say who or what this force is unless all human beings work together to stop this evil force. The fight for non-violence is in politics, in art, or in culture--wherever life is at stake. This fight is the fight of all mankind. "[3]

She did not stop herself only at erecting monuments and sculptures of the poet but also worked for the Japan-India Tagore Association formed in 1971 by his blessed renowned Tagore researcher and Tagore activist Professor Kazuo Azuma. With the interest and cooperation of Tomi Koura and several other senior Tagore-devotees, Professor Azuma completed Rabindranath's Dream, "Japan Bhavan" (Japan faculty) with the opening as a "Nippon Bhavan" in Sriniketan, Shantiniketan in 1994. However, in the previous year 1993, this majestic Tagore devotee Tomi Koura passed away.

If she had survived, she would have attended the inauguration ceremony because Gurudev was her lifelong adored life god! It is rare to say such a woman devotee in the whole life of Rabindranath Tagore. The dream of Tagore was realized because she made great efforts, and 12 volumes of the Japanese version of the collection of Tagore's writings were completed. I still believe that her power lies behind this long-standing exchange between Japanese and Bengali.

Relationship between Rabindranath and the revolutionary Rash Behari Bose:

The second incident is Rabindranath Tagore's relationship with the revolutionary Rash Behari Bose. Behari Bose fled to Japan in 1915 and took refuge. Did he have a relationship with Rabindranath before he emigrated to Japan? As far as the information has been read, there is no good answer. It is known from several sources that after the assassination attempt of Lord Hardinge, the governor adopted by the revolutionary Rash Behari Bose in 1912 failed, he fled to different places for two years in India. The British government could not figure out who was the hero of this conspiracy. But two years later, in 1914, when the main plotter, Rash Behari Bose, was found guilty, an arrest warrant was issued against him with photographs. Then he decided to leave India. But how? This year, the news through the newspapers that the newly Nobel laureate poet Rabindranath Tagore is going to Japan. He knew that several revolutionaries had already fled to Japan and taken refuge. Then he thought about this opportunity to go to Japan. He took

preparation as a relative of Rabindranath under a pseudonym and left India earlier for a trip to Japan. According to that decision, he entered Japan in 1915 aboard a Japanese ship "Sanukimaru" under the pseudonym PN Tagore (Priyonath Tagore). It is thought that Rabindranath Tagore could not have imagined the far-reaching history of the news of his first visit to Japan. While Rash Behari Bose was in Dehradun, Priyonath Tagore, a relative of Rabindranath, lived there. So, if he goes to Japan under this name, no one will suspect him because more than a decade ago, in 1902, Rabindranath's close friendship and cultural ties with Japan were established in Calcutta with OkakuraTenshin, a well-known influential Japanese thinker and art historian. As a result, he did not have to cross any hurdle to enter Japan under the pseudonym of Rabindranath Tagore. He passed all the screening tests till boarding and landing.

Meanwhile, the real facts are known from the memoirs of Rash Behari Bose written by Nikki Kimura, a Japanese Buddhist scholar living in Calcutta at that time, a professor of Pali language at Calcutta University, a Bengali language scholar, and a close friend of Rabindranath. There he wrote: "..... the poet decided to visit Japan in the autumn of 1914 and requested me not to go to Japan earlier as an interpreter and to prepare for the next year." ..... "When that news was published in the newspaper, it came to the notice of Mr. Bose later. Mr. Bose, a relative of the poet, sailed for Japan on a Japanese ship named PN Tagore to prepare for his trip to Japan (I heard this later from Mr. Bose). The poet visited Japan the following year in 1916, his first visit to Japan." [4]

When Rabindranath came to Japan, the revolutionary Rash Behari Bose already fled to Japan. The British government announced a reward of 12,000 rupees hanging over his head. Behari Bose and his revolutionary colleague Hermbalal Gupta, who fled to Japan shortly after him, both were ordered to leave Japan by the Japanese government in a treaty of friendship with the British signed in 1902. A similar fugitive in Japan at the time was the great revolutionary Dr. Sun Yat-sen, a Chinese nationalist leader and became later the father of the Chinese nation. He was given political asylum by guru Mitsuru Touyama. Behari Bose met Sun Yat-sen. Dr. Sun-yat after listen their description took them to his patron guru Touyama and introduced them. Respected Mitsuru Touyama, a powerful ultra-nationalist political figure and Pan-Asianist of the time, came forward to protect them in their political situation. They hid inside an abandoned painting studio or atelier in the "Nakamuraya" building, then a well-known business enterprise in Tokyo, to protect them from police through political asylum. Did Behari Bose then introduce himself to guru Touyama as "PN Tagore?" Nothing is known about that.

Though "Nakamuraya" could not be kept hidden for long. When the police found him, he was removed from there. Thus, Behari Bose has to spend his life in hiding in many places. It is no exaggeration to say that even though Rabindranath Tagore stayed in Japan for about three months, he may not meet Behari Bose due to his flight.

Rash Behari Bose's marriage to Toshiko Souma, the daughter of Aizou Souma, the owner of the "Nakamuraya" enterprise, was consummated in 1918 when there was no more upheaval. Even after the marriage, the newlyweds had to move to Tokyo 17 times and live in hiding. In this uncertain life, Behari Bose has worked tirelessly for the independence of his country. After his marriage, he became known as "Nakamuraya no Bousu", or "Nakamuraya's Bose" a popular revolutionary figure. He was released in 1923 after acquiring Japanese citizenship. But Toshiko Bose, a 26-year-old young lady, died in 1925 of pneumonia or tuberculosis due to overwork and cold. Respecting his wife's love, he did not remarry despite the request of his mother-in-law Kokko Souma. Rash Behari Bose was a very ethical man.

Two years after the incident, in collaboration with his father-in-law, Aizou Souma started a curry restaurant called "Indo no Mon" or "Gate of India" on the second floor of the "Nakamuraya" company. That restaurant became the center of the Indian independence struggle until the end of World War II. It was here that other expatriate revolutionaries gathered, including Japanese supporters and influential people of various levels who were close friends of Rash Behari Bose; discussion meetings and curry events were held. The original "Indo Curry-Rice" or "Indian Curry" made by Behari Bose is still popular and legendary even today. Behari Bose, a relentless activist, fought uncompromisingly for the freedom of the motherland till the last day of his death under the umbrella of guru Mitsuru Touyama. He died on January 21, 1945, at home.

During Rabindranath's visit to Japan, of course, the news of the escape of the revolutionary Rash Behari Basu to Japan he also must have known in India as well. Did they meet in Japan in 1916? Was he interested in meeting Behari Bose once? That information is not available. Although not seen, there is no doubt that he was satisfied to know that, an Indian native warrior who came to Japan for the independence of his motherland under the sake of Rabindranath Tagore was far ahead of the others. A proof of this realization was found during the third voyage in 1924. Higuchi Tetsuko, the daughter of Rash Behari Bose, narrates: "Rabindranath sent a letter to Rash Behari from Peking, China, before coming to Japan. While in Tokyo he sought his cooperation. After arriving in Japan as planned, he met Behari Bose. They exchanged views on Indian independence." 5

At this time Rabindranath encouraged Rash Behari Bose to fight for the independence of his country, I think. The news of this meeting reached his patron guru Touyama as well as other influential politicians and intellectuals of the time who were well-wishers of Behari Bose. They can now understand the importance of why Rash Behari Bose entered Japan as "PN Tagore." The fact that Rash Behari Bose is an important figure in the Indian independence movement proves this more clearly to the Japanese. As a result, with the blessings of Gurudev, Behari Bose continued to work for the support and cooperation of the Japanese people with renewed vigor in Japan, in spite of government restrictions.

During this time, the poet went to the "Nakamuraya" building of Behari Bose's father-in-law and met his family and mother-in-law. The notable chapter of this third journey is to introduce Gurudev to Guru Mitsuru Touyama. The poet was given a lavish reception at the Ueno "Seiyouken" a Franch restaurant in Tokyo on June 12 at the initiative of guru Touyama's secret political organization "Genyousha." Multiple commemorative photographs of the reception bear witness to that historic event. On the occasion, looking at guru Touyama, Rabindranath expressed his deep gratitude for his great service and cooperation with the Indian revolutionaries, who had taken refuge in Japan. This reception is a very important event in the history of Japan-Bangla-India. Not only that, but in 1929 also Rabindranath was interested in meeting guru Touyama, but he could not meet him as he was on a trip to China. Rabindranath wrote a letter in which he paid tribute to Touyama for his generosity and dedication to the welfare of mankind. Thus, in 1943, Rash Behari Bose was able to cross another historic step of continuous progress with the help of influential Japanese politicians and military officials to bring the undisputed leader of the Indian independence struggle, Subhash Chandra Bose, to Japan from Germany. What happened next is a known and unknown history between the two countries.

During Rabindranath's last visit to Japan in 1929, Rash Behari Bose arranged for the poet to stay at the residence of his friend, the industrialist and thinker Dr. Kunihiko Oukura at his splendid residence in Meguro, Tokyo. Here Rabindranath stayed for three weeks and formed a deep friendship with Kunihiko. The two exchanged views on various issues. Kunihiko gave the poet the very best hospitality. The relationship was so deep that Dr. Kunihiko respectfully played an outstanding role in celebrating the centenary of the poet after the 2nd world war. He took the three-and-a-half-year master plan in 1958. He became the president of the Tagore Memorial Association. It is difficult to find a comparison of what a huge amount of work and events have been done! I have tried to write this history in detail in the book in Bengali "Rabindranath Ebong Japan: Shoto Borsher Somporko" or "Rabindranath and Japan: The Relationship of the Centenary" published on the occasion of Rabindranath's 150th birth anniversary in 2011. Also published the book later in the same year as a transcreated version in English with the title: "Rabindranath Tagore: India-Japan Cooperative Perspectives" from India Center Foundation in Japan.

In fact, it was under the influence of Rabindranath and Okakura's oriental orientation that the large-scale "India-Japan Global Partnership Summit" was held in Tokyo in 2011--privately for three days. Behind these two events, Tagore's birth centenary celebration and IJGPS was the extensive cooperation of the two governments. That is why Rabindranath's first visit to Japan in 1916 is a very significant event. Netaji Subhash Chandra Bose whom Rabindranath called a "Statesman" -- would not have been able to come to Japan if Rash Behari Bose had not come to Japan earlier as a chance of Tagore's Japan trip. "The Azad Hind Fauj" or "INA = Indian National

Army" and Netaji's campaign to "Imphal" the capital of the Indian state of Manipur would not have been formed with the Japanese Imperial Army. Despite Japan's defeat in World War II, the captive forces of the INA revolted due to the prudent patriotism of Rash Behari Bose and Netaji, and incidentally the British were forced to relinquish power--India gained its much-desired independence in 1947.

Not only that, but the followers of all the influential political leaders and eminent intellectuals who were close friends and supporters of guru Touyama's beloved revolutionary Rash Behari Bose later supported the Bengalis in Japan during the Bangladesh War of Independence by forming public opinion, raising money and cooperating relief to the refugees sheltered in India. On 10th February 1972, Japan recognized independent Bangladesh. In 1973, an unimaginable reception was given to the architect of Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in Tokyo. After independence in 1972, the Japanese government sent three prominent Japanese nationals to Dhaka to invite Bangabandhu to visit Japan. They are influential politicians, MP, and former Labor Minister Mr. Takashi Hayakawa, Netaji's comrade-in-arms lieutenant general Iwaichi Fujiwara and prominent journalist, writer, and political figure Masaaki Tanaka. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman came on a state visit at the invitation of the Government of Japan. At that coloured state reception, the then nationalist leader, Prime Minister Mr. Kakuei Tanaka, began his inaugural address with a history of Okakura-Rabindranath friendly relations.

Notes:

1.2.3. Hi Chen O Ikiru / Koura TomiJiten / DomezShuppan / Tokyo / 1983
4. Indo Dokuritsu no Shishi to Nihonjin / Hara Yoshiaki / Tendensha / Tokyo / 2003
5. Chichi Bousu / Higuchi Tetsuko / Hakusuisha / Tokyo / 2006

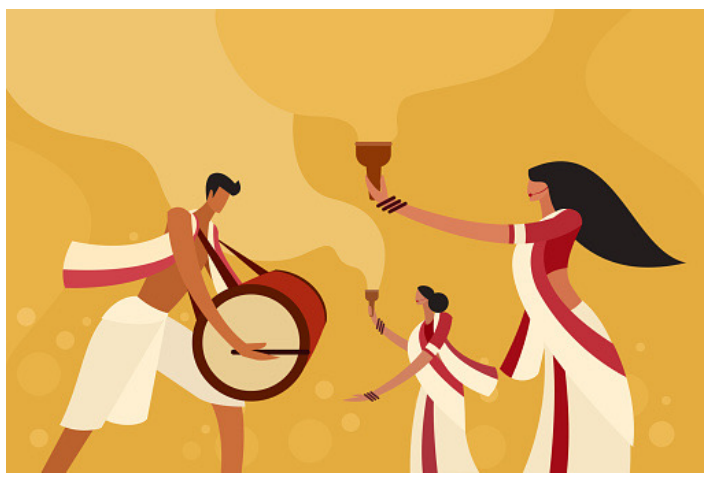

কিছু কথা

শুভব্রত মুখার্জী

১৯৭০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ২৫ বছর পূর্তি । পোল্যান্ডের Warsaw তে এসে পৌঁছলেন জার্মান Chancelor Willy Brandt। উদ্দেশ্য Warsaw Treaty তে সই করা। বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে রাগ , অভিমান আর ভুল বোঝাবুঝির পাহাড় জমে আছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় পোল্যান্ডের ওপর নাৎজি বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারের ঘা তখনও দগদগে। এদিকে ১৯৭০ এর পোল্যান্ডে চলছে কমিউনিস্ট শাসন। Iron Curtain সরিয়ে সে দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও জার্মানির পক্ষে বেশ মুশকিলের। সেদিক থেকে দেখতে গেলে Warsaw Treaty র গুরুত্ব প্রচুর। কারণ এ চুক্তি দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে হয়তো দৃঢ় করবে I কাজেই international media ঝাঁপিয়ে পড়েছে Warsaw তে। যেকোনো রাষ্ট্রপ্রধানের বিদেশ সফরেই মূল কাজ ছাড়াও থাকে একগুচ্ছ অন্যান্য কর্মসূচি। Willy Brandt এর ও ছিল সেরকমই অনেক কিছু। সইসাবুদ মিটে যাওয়ার পর ৭ই ডিসেম্বরের কনকনে ঠান্ডায় সেরকমই একটা আপাত কম গুরুত্বের কর্মসূচি ছিল ১৯৪৩ সালে বিশ্বযুদ্ধের সময় হওয়া Warsaw Ghetto Uprising এ মৃত ইহুদিদের স্মৃতিসৌধে মাল্যদান। শহরের মাঝে নোংরা বস্তিতে কয়েক লাখ ইহুদিদের আটকে রাখা হতো বিশ্বযুদ্ধের সময়। নাগরিক সুযোগসুবিধা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা কারণ সেসব Ghetto থেকে তাদের নিয়ে যাওয়া হতো সারা পোল্যান্ড জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মারার জন্য। ১৯৪৩ সালে যখন হিটলার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল Warsaw এর এরকমই একটা Ghetto র ওপর , শুরু হয়েছিল ইহুদিদের প্রতিরোধ। প্রায় এক মাস ধরে চলা সেই প্রতিরোধে মারা গেছিলেন প্রায় ১৩,০০০ ইহুদি মানুষ I তাদেরই স্মৃতির উদ্দেশ্য তৈরী হওয়া সৌধে মালা দেবেন জার্মান রাষ্ট্রপ্রধান। গম্ভীর আর বিষন্ন মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন Willy Brandt। দুজন সহকারী সামনে এগিয়ে চলেছে মালা নিয়ে। সৌধে মালা রাখা হলো। মালার ওপর একটা রিবন একটু কুঁচকে ছিল। Willy হাত দিয়ে টেনে ঠিক করে দিলেন সেটা। ঠিক এরপরেই ঘটলো সেই একেবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা যার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ পরিবেশ, পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে স্মৃতিসৌধের সামনে হাঁটু গেড়ে সটান বসে পড়লেন জার্মান রাষ্ট্রপ্রধান। হিটলার বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারের জন্য ক্ষমা চাইলেন ইহুদিদের কাছে।

এতকাল ধরে হাজার সান্তনা বাক্য , কথার কচকচানি যা করতে পারেনি, তিরিশ সেকেন্ডের একটা Gesture অনায়াসে করে দিলো সেটা I দু দেশের সম্পর্কের বরফ গললো অনেকটাই।

না ! এ ক্ষমা চাওয়া Willy Brandt এর ব্যাক্তিগত ক্ষমা চাওয়া নয়। একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে সমগ্র জার্মান রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অন্য একটা দেশের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া । সভ্যতার ইতিহাসে বিরল বটে এ ঘটনা, কিন্তু একমাত্র নয়। বরং গত শতাব্দীর ইতিহাস খুঁড়লে বেরিয়ে আসে এরকম বেশ কিছু মণিমুক্তো। বছর পাঁচেক আগে, মানে ২০১৬ সালে কানাডার প্রধানমন্ত্রী Justin Trudeau র কথাই ধরা যাক না। কানাডার House of Commons এ দাঁড়িয়ে যে ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন Trudeau, সে ঘটনার সঙ্গে ভারতবর্ষের একেবারে সরাসরি যোগাযোগ। সে ঘটনার জন্য ফিরে যেতে হবে প্রায় এক শতাব্দী আগে। সেই ১৯১৪ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে গেছে তখন। সারা পৃথিবী থেকে খাদ্য আর আশ্রয়ের জন্য হাজার হাজার শরণার্থী পৌঁছচ্ছেন কানাডাতে। স্বাভাবিকভাবেই সেদেশের অভিবাসন আইনের

কড়াকড়ি বেড়েছে। এরকমই একটা সময় British Honkong থেকে ভারতীয়দের একটা জাহাজ Komagata Maru, চীনের Shanghai, জাপানের Yokohama বন্দর ছুঁয়ে পৌঁছলো কানাডার Vancouver এ। জাহাজে প্রায় ৩৭৬ জন যাত্রী। সবাই আশ্রয় নিতে চায় কানাডায়। কিন্তু অভিবাসন আইনের জটিলতায় আর হয়তো বা শেতাঙ্গপ্রিয় কানাডা সরকারের এক চোখামির কারণেই অনেক টালবাহানার পরে মাত্র ২০ জনকে ঢুকতে দেওয়া হয় কানাডায়। বাকি যাত্রীরা জাহাজে আটকে থাকেন বহুদিন আর তারপর জোর করে সে জাহাজকে বের করে দেওয়া হয় কানাডা থেকে। নিরুপায় হয়ে আবার সমুদ্রে ভেসে পরে Komagata Maru এবং প্রায় দুমাস পর এসে পৌঁছয় কলকাতায় মানে আসলে Budge Budge এর ডক এ। এরপরের ঘটনা জটিল এবং দুঃখ জনক। যুদ্ধের বাজারে ব্রিটিশ সরকার দেশে ফিরে আসা এই একদল লোককে ভেবে নিয়েছিল আইন ভাঙা একদল বিপ্লবী বলে। কাজেই শুরু হয় সংঘাত। চলে গোলাগুলি। প্রায় ১৯ জন যাত্রী মারা যান গুলির আঘাতে। কিছু লোক পালিয়ে যান। কিন্তু অধিকাংশকেই গ্রেপ্তার করে আটকে রাখা হয় পুরো বিশ্বযুদ্ধের সময় জুড়ে। সময়টা প্রায় চার বছর। ২০১৬ সালে কানাডার প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন Komagata Maru র সেদিনের সব যাত্রী আর তাদের পরিবারের কাছে। মেনে নেন সেদিন কানাডা সরকার যদি আরো সংবেদনশীল হত তবে হয়তো কলকাতায় ফিরে আসতেন না এতজন নিরুপায়, নিরাশ্রয় মানুষ। বাঁচতো অনেকগুলো প্রাণ, এড়ানো যেতে পরের চার বছর কয়েকশো মানুষের দুর্বিষহ জীবন।

Willy Brandt এর হাঁটুগেড়ে ক্ষমা চাওয়া বা Justin Trudeau র কানাডিয়ান পার্লামেন্টে ক্ষমা চাওয়ার ঘটনাগুলো খুব স্পষ্ট আর একমাত্রিক। মুশকিলের কথা হচ্ছে এক রাষ্ট্রের কাছে অন্য রাষ্ট্রের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ঘটনা সবসময় এতটা সরলরেখায় চলে না। সেরকম উদাহরণও ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে। খুব হাতের কাছের এবং অবশ্যই বিতর্কিত উদাহরণ আমাদেরই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান আর বাংলাদেশের। সত্তরের দশকে একটা দেশের সরকারের সে দেশেরই অসংখ্য মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী এখনো মুখে মুখে ফেরে। বাংলাদেশের মানুষের মনে পাকিস্তান বিরোধিতার আগুন জিয়িয়ে রাখতে সে দেশের বর্তমান সরকার , থুড়ি , ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দল নিয়ম করে মানুষকে মনে করিয়ে দেন খানসেনাদের অত্যাচারের কাহিনী। একথা অবশ্যই সত্যি যে আধুনিক প্রজন্মের জানা উচিত দেশের অতীত। পাকিস্তান সেনার অত্যাচারের কাহিনী নির্মমতার জ্বলন্ত দলিল। কাজেই দেশের মানুষকে সেকথা নিরন্তর মনে করিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো ভুল নেই I কিন্তু পাকিস্তানবিরোধী প্রচারে এ কথাও প্রায়শই বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশে যে পাকিস্তান কোনোদিনই বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চায়নি। অথচ প্রমান বলছে এ ঘটনা পুরোপুরি সত্যি নয়। তথ্য বলছে ১৯৭৪ এ বাংলাদেশ, ভারত , পাকিস্তান এই তিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভায় পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যে অন্যায় আর অত্যাচার হয়েছে , পাকিস্তান তার নিন্দা করে। তারা এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করছে। এখানেই শেষ নয়। বরং New York Times এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো স্বয়ং বাংলাদেশ সফর চলাকালীন , বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষকে বলেছেন , ১৯৭১ এ বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের মূল হোতা ইয়াহিয়া খানের সাথে সারা পাকিস্তানের মানুষকে যেন এক করে না ফেলেন বাংলাদেশের মানুষ I তিনি বলেন পাকিস্তান এ কাজের জন্য অনুতপ্ত।

আসলে ইতিহাস বিকৃতি ব্যাপারটাকে সারা পৃথিবী জুড়ে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সারা পৃথিবীজুড়ে সন্ত্রাসবাদী কাজের ঘাঁটি হিসেবেই আধুনিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ খুব সহজে প্রকাশ করে দেওয়া যায়। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের কাছে সেটাই যথেষ্ট নয়। কাজেই পাকিস্তানের ক্ষমা না চাওয়ার মতো মিথ্যে কথার বেসাতি করে কিছু রাজনৈতিক নেতা পাকিস্তান বিদ্বেষটাকে আরো গনগনে করে দিতে চাইছে।

ইতিহাসের কাছে কৈফিয়ত দিতে তাদের বয়েই গেছে !!

ক্ষমা চাওয়ার এ আখ্যানে, ২০১৬ সালের একটা ঘটনা আরেক স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। বারাক ওবামার জাপান সফর এবং কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে হিরোশিমা। ১৯৪৫ এর অগস্ট মাসের সেই রাতের চেয়েও অন্ধকার সকালের পরে প্রথম কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট আসছেন হিরোশিমায়। এর আগের মার্কিন প্রেসিডেন্টরা অবশ্যই এসেছেন জাপান সফরে । কিন্তু সযত্নে এড়িয়ে গেছেন হিরোশিমা। ওবামা ব্যাতিক্রম। কাজেই বিশ্বজুড়ে তৈরী হয়েছে কৌতূহল। তবে কি ৭০ বছর আগের নরহত্যার জন্য ক্ষমা চাইবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ? যদি সত্যিই ক্ষমা চান তবে সেটা হবে যুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনীনিতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আর সে ঘটনা যদি ঘটে হিরোশিমার War Memorial এর সামনে দাঁড়িয়ে ? আরেকটা ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে ছিল সবাই। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণগুলো এত সোজাসাপ্টা নয় আসলে। কাজেই anti climax !! সব জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে ওবামা সাংবাদিকদের স্পষ্ট জানালেন যে তিনি ক্ষমা চাইবেন না। শুকনো কিন্তু দৃঢ় গলায় জানিয়ে দিলেন যে হিরোশিমায় যা ঘটেছিলো তার জন্য তিনি দুঃখিত। কিন্তু যুদ্ধের সময় এমন অনেক সিদ্ধান্তই নেওয়া হয় যে সিদ্ধান্তগুলো কাঁটাছেড়া করার দায় ইতিহাসবিদদের। তার নয়। কাজেই ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

বাস্তবের সবসময় নাটকীয় হওয়ার কোনো দায় নেই!

অক্সফোর্ড ইউনিয়ন বিতর্কসভায় Sashi Tharoor এর স্পষ্ট , দীপ্ত এবং সাহসী বক্তৃতা যারা শুনেছেন তাদের অনেকেরই ভারতীয় হিসেবে আরেক বার গর্ব হয়েছে নিশ্চয় । যারা দেখেননি চট করে Youtube এ দেখে নিতে পারেন I একেবারে খোদ সাহেবদের ডেরায় দাঁড়িয়ে সাহেবদের বিরুদ্ধে এমন আক্রমণ সেই ২০০২ এর লর্ডস এর গেন্জিকান্ড ছাড়া আর বিশেষ মনে পড়েনা স্মৃতি হাতড়ালে। বিতর্কের বিষয় ছিল ব্রিটেনের ভারতকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত কিনা। Typical Tharoorian wit দিয়ে বক্তব্য শুরু করেছিলেন Dr Tharoor একথা বলে যে "No wonder that the sun never sets on the British Empire because even God couldn't trust the English in the dark" I আর তারপর পনেরো মিনিটের ঝোড়ো ইনিংসে ইতিহাস ঘেঁটে, পরিসংখ্যানের পর পরিসংখ্যান দিয়ে Tharoor পরিষ্কার করে দেন ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের কদর্য রূপটাকে। দেখিয়ে দেন কেন ব্রিটেন ক্ষতিপূরণের দায় অস্বীকার করতে পারে না। না, টাকার অংকে ক্ষতিপূরণ চান নি তিনি। বলেছিলেন ব্রিটেন স্বীকার করে নিক তারা শোষণ করেছে ভারতকে আর প্রতীকী ক্ষতিপূরণ দিক ২০০ পাউন্ড মানে ২০০ বছরের শাসনের জন্য প্রতি বছর ১ পাউন্ড করে। আর তারপর পরবর্তীকালে একাধিক ইন্টারভিউতে বলেছেন যে ব্রিটেন ক্ষমা চেয়ে নিক ভারতের থেকে। বলেছিলেন ১৯১৯ সালে মানে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ১০০ বছর পূর্তিতে ব্রিটিশ রাজপরিবারের কেউ কিংবা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জালিয়ানবালাবাগে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়ে নিন।

নাহ ! সেসব কিছুই হয়নি। ২০১৯ চলে গেছে অনেককাল।

কোনো এক সুদূর ভবিষ্যতে বাস্তব হয়তো সত্যিই একদিন নাটকীয় হয়ে উঠবে। হয়তো....

একটা রাষ্টের ক্ষমা চাওয়া যে সবসময় অন্য একটা রাষ্ট্রের প্রতিই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। রাষ্ট্র ক্ষমা চাইতেই পারে নিজের দেশের মানুষের কাছেও। যেমন চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী। যে ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন সে বড় দুঃখের এক ইতিহাস। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অস্ট্রেলিয়ার শাসনক্ষমতায় থাকা শেতাঙ্গদের মনে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী যারা তাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। জনসংখ্যা কমতে কমতে তারা বোধহয় বিলুপ্ত হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। তাই সেসব আদিম অধিবাসীদের নতুন প্রজন্মকে সমাজের মূলস্রোতে, মানে শেতাঙ্গদের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা দরকার। যেমন ভাবা তেমন কাজ। সংবিধান সংস্কার হলো এবং সেই আজব আইন রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দিলো শিশুদের তাদের পরিবার পরিজনের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসার এবং শেতাঙ্গ জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার। এ জিনিস চললো প্রায় ৭০ বছর। মানে প্রায় সেই ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। হাজার হাজার শিশুকে মা বাবাকে ছেড়ে আশ্রয় নিতে হলো সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে।পরবর্তীকালে অবশ্য হিসেবে করে দেখা গেলো কাজের কাজ তেমন কিছু হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব শিশুরা হারিয়েছে শৈশব , নতুন পরিবারগুলোর থেকে ভালোবাসা পেয়েছে নামমাত্র , বহুক্ষেত্রেই কাটিয়েছে তীব্র অনাহারে , জড়িয়ে পড়েছে অপরাধজগতে , অনেকেরই পড়াশুনো গোল্লায় গেছে। মোটের ওপর এই একুশে আইন জন্ম দিয়েছে একের পর এক "stolen generation " এর যাদের অতীত বা ভবিষ্যৎ হতে পারতো অনেক অন্যরকম , অনেক ভালোবাসায় ভরা। বহুকাল পরে মানে সেই ২০০৮ সালে অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী Kevin Ruud ,পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ২০ মিনিট ধরে ক্ষমা চেয়ে নেন এই সমস্ত শিশু আর তাদের পরিবারের কাছে । সরকার স্বীকার করে নেয় অপরাধ।

কদিন আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছ থেকে। এ ক্ষমা চাওয়া হয়তো Kevin Ruud এর মতো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া নয়, এ হয়তো একান্তই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত অনুভব I কিন্তু এ অন্ধকার সময়ে নিঃসন্দেহে এ ঘটনা এক চিলতে রোদ্দুরের মতো। ক্ষমা চাওয়া বোধহয় সবসময় দুর্বলতার লক্ষন নয়। সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে অতীতকে ভুলে এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে যাওয়াও বটে। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে এরকম একচিলতে রোদ্দুর আমাদের ভাগ্যে জোটে বড় কম। গুজরাট দাঙ্গায় অত্যাচারিত আর মৃত মানুষদের উদ্দেশ্যে তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা চেয়েছিলেন কি চাননি তাই নিয়ে বিতর্ক বিস্তর। মিডিয়া রিপোর্ট পরস্পরবিরোধী। মানে স্পষ্টতই স্পষ্টবাদিতার অভাব। একই রকম অস্পষ্ট কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৯৮৪ দাঙ্গার জন্য ক্ষমা চাওয়ার ঘটনা। পাঞ্জাবের ভোটপ্রচারে সোনিয়া গান্ধী কিংবা রাহুল গান্ধী বিচিত্র ও জটিল কথার মারপ্যাঁচে মাঝে মাঝে যে ক্ষমা চাননি তা নয়। কিন্তু ক্লাস ফাইভের বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারবে সে ক্ষমা চাওয়ার অন্তঃসারশূন্যতা। কিংবা ধরা যাক এমার্জেন্সির কথা। শোনা যায় প্রখ্যাত সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ এমার্জেন্সির সময় মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছিলেন হঠাৎ একদিন, যেমন মানুষ করেই থাকে প্রিয়জনের মৃত্যুতে। কৌতুহলী মানুষজনের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন মারা গেছে বড় প্রিয় একজন , গণতন্ত্র। তো সেই গণতন্ত্রকে গলা টিপে মারা ইমার্জেন্সি র পর বহুবার ক্ষমতায় এসেছে কংগ্রেসি সরকার। দল বা রাষ্ট্র কোনো পক্ষই ক্ষমা চাওয়ার কথা চিন্তাও করেনি। বরং এইতো সেদিন, কংগ্রেসের বর্ষীয়ান এবং বুদ্ধিজীবী নেতা সালমান খুরশিদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অকপটে বলেছেন এমার্জেন্সির জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। সেদিন সরকার যদি অপরাধ করে থাকে তবে ভারতবর্ষের মানুষ ও নাকি সমান অপরাধ করেছিল। কারণ তারাই আবার

মিসেস গান্ধীকে ভোটে জিতিয়ে এনেছিল এমার্জেন্সির পর।

তুখোড় আইনজীবী সালমানের কথায় আইনজীবীর চাতুর্য আর যুক্তি আছে বটে , কিন্তু তিনি পরেরদিন আয়নার সামনে দাঁড়াতে পেরেছিলেন তো ? কে জানে !!

সমান দোষে দোষী কিন্তু কম্যুনিস্টরাও। শোনা যায় বুদ্ধবাবু নন্দীগ্রামের ঘটনার জন্য ব্যাক্তিগত ভাবে ক্ষমা চেয়েছিলেন। কিন্তু আরো অনেক বড় গণহত্যা মরিচঝাঁপি ? কালের গভীরে হারিয়ে গেছে সে ঘটনা।

আসলে লিস্ট বানাতে বসলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। সরকার বা রাজনৈতিক দলের থেকে ক্ষমা প্রার্থনা আশা করাটাই হাস্যকর এবং অবাস্তব শোনাতে পারে আজকের ভারতবর্ষে। অতীত কিন্তু অন্য কথা বলে। যদি পিছিয়ে যাই অনেক অনেক বছর , যীশুর জন্মের প্রায় ২৬০ বছর আগে। সদ্য যুদ্ধ জিতে ওঠা এক সম্রাট উপলব্ধি করলেন নিজের অন্যায়ের কথা, অনুভব করলেন সম্রাট হিসেবে নিজের দায়িত্ব। সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিলেন শান্তির বাণীর ছত্রে ছত্রে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা।

সত্যি , মিথ্যে , অতিকথন আর মিথ পেরিয়ে তাই আজ ও তিনি মহামতি একনায়ক I যার চিহ্ন মাথায় করে দু হাজার বছর পরেও এগিয়ে চলেছে পৃথিবীর সবথেকে বড় গণতন্ত্র I

জালিয়ানওয়ালাবাগ - কেন ভারতীয়দের উপর ভারতীয়রা গুলি চালায়

তুহিন ঘোষ

আমি কয়েক বছর হংকং-এ থাকতাম। আমি লক্ষ্য করেছি যে একটি ঘটনা হল যে হংকংয়েররা সাধারণভাবে ভারতীয়দের পছন্দ করে না এবং তাদের অনেকেই এমনকি আমাদের ঘৃণা করে। একজন ভারতীয় বাড়ি খুঁজতে যান বা মুদি কিনতে রাস্তায় যান না কেন, অনুভূতিটি স্পষ্ট। অনেক ভারতীয় যাদের সাথে আমি কথা বলেছি তারা বলেছে যে তারা এটি বেশ দৃঢ়ভাবে অনুভব করে। আমি বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। অবশেষে স্থানীয় এক বন্ধুকে কারণটা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি হংকংয়ের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ ছিলেন। প্রথমে তিনি অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিলেন যে এর অস্তিত্ব আছে কিন্তু পরে বলেন এর শিকড় ঐতিহাসিক।" আপনি কি জানেন," তিনি বলেছিলেন, "ব্রিটিশরা 1841 সালে হংকংয়ে এসেছিল এবং যখন তারা স্থানীয়দের সহায়তায় প্রথম পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, তখন তারা বুঝতে পেরেছিল যে স্থানীয়দের আনুগত্যকে তাদের আদেশ অনুসরণ করার জন্য বিশ্বাস করা যায় না বা তাদের সহকর্মী ভাইরা বিদ্রোহ করলে বা বিদ্রোহ করলে গুলি করে হত্যা করুন। কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছিল যে ভারতে তাদের একই অভিজ্ঞতা নেই। তাই তারা ভারতীয়দের নিয়ে এসেছে। ভারতীয়দের প্রথম ব্যাচ যারা এখানে এসে নির্মম ও নির্যাতন করেছিল। স্মৃতি এখনও এখানকার প্রতিটি মানুষের মনে বাস করে এবং আমরা এর জন্য আপনাকে ক্ষমা করিনি এবং কখনই করব না, "তিনি গভীর আবেগময় কণ্ঠে বলেছিলেন।" তোমরা ভারতীয়রা আদেশ অনুসরণ করেছ এবং আমাদের প্রতি এমন কোনো করুণা দেখাওনি যা আমরা আশা করেছিলাম আপনি করবেন। "আমি কেবল তার কাছে ক্ষমা চাইতে পারি এবং বলেছিলাম এটি একটি অবিচার ছিল। কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন তা আমাকে বিরক্ত করেছিল। সামাজিক বিজ্ঞানে 'অপর' একটি শব্দ যা বোঝায় যে কীভাবে মানুষ বিভক্ত হয়, অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে দেয়াল তৈরি করে যাদের তারা তাদের অনুরূপ এবং এমনকি নিকৃষ্ট বলে মনে করে। আমেরিকানদের জন্য 'অপর' হল আমেরিকার বাইরে থাকা প্রত্যেকেই। বৃটিশদের কাছে যারা শ্বেতাঙ্গ নয় এবং দেশের বাইরে তারা সবাই ‘অপর’। পাকিস্তানের লোকটির জন্য এটি ভারতীয় হয়ে গেছে। চীনাদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু ভারতীয়দের জন্য কৌতূহলের বিষয় হল যে অনেক ভারতীয়দের কাছে 'অপর' একজন বহিরাগত নয়, অন্য একজন ভারতীয় যার সাথে তার গভীরতম খাদ নিহিত। তিনি এমন একজন যাকে আমরা শত্রুতে পরিণত করি। “তোমরা ভারতীয়রা, জালিয়ানওয়ালাবাগের মতোই তোমরা নিজেদের লোকদের সঙ্গে করেছ। এভাবেই ব্রিটিশরা আপনার জাতিকে দুই শতাব্দী ধরে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তাই না?” সেই থেকে ঐতিহাসিকের কথা আমার কাছে থেকে গেছে।

তার একটি বইতে, লেখক অমিতাভ ঘোষ লিখেছেন যে ব্রিটিশরা বিশ্বাস করত যে ভারতীয়রা সর্বদা নির্মমভাবে তাদের ভারতে বা অন্য কোথাও তাদের নির্দেশে যে কাউকে নির্মমভাবে নামিয়ে দেওয়ার জন্য নির্ভর করা যেতে পারে, যা তারা কখনও কল্পনাও করতে পারে না। অন্য কেউ .একজন জাপানি কি কখনো বিদেশী জেনারেলের নির্দেশে তার নিজের জনগণের উপর গুলি চালাতে বিশ্বাসী হবে? একজন চীনা সেনাবাহিনীকে জিজ্ঞাসা করা হলে কি তা করতে পারত? আমি বিশ্বাস করি উত্তর একটি বড় না .প্রাক্তন ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন জেনারেল যেমন বলেছিলেন, "ব্রিটিশরা ভারতীয় জনগণকে বিশ্বাস করতে পারদর্শী ছিল যে তারা সত্যের পক্ষে লড়াই করছে এবং তাই

যখন ভারতীয়রা একজন সহভারতীয়দের সাথে লড়াই করেছিল তখন তারা তাকে খারাপ হিসাবে দেখেছিল এবং অনুভব করেছিল। সামান্য বা কোন অপরাধবোধ তাকে হত্যা করে। "এই কারণেই কি আজও আমরা গভীরভাবে বিভক্ত, একজন ভারতীয় সহকর্মীকে অত্যাচার করতে পারি এবং সামান্য সহানুভূতি অনুভব করতে পারি, এমনকি তাকে গুলি করতে বা তাকে পিটিয়ে হত্যা করতে পারি? কেন আমরা ভারতীয়রা একে অপরের মধ্যে 'অপর' তৈরি করেছি এবং অন্যান্য জাতির মতো বাইরে নয়? একবার, একজন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ, জালিয়ানওয়ালাবাগের উল্লেখ করে বলেছিলেন যে একটি ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী বা সেনাবাহিনী কখনই তাদের নিজস্ব লোকদের উপর গুলি চালাবে না যদি তা করতে বলা হয়। তাহলে আমরা ভারতীয়রা কেন এটা করলাম? আমি বিশ্বাস করি যে এই দ্বিধাটির উত্তর খুঁজে পাওয়া মূল্যবান। কেন পুলিশ বাহিনী মাইকেল ডায়ারের আদেশ মানতে অস্বীকার করেনি এবং তাদের নিজের লোকদের উপর গুলি চালায়নি? কেন ব্রিটিশরা ভারত শাসন করতে পারে তা বোঝার ক্ষেত্রে এটি সম্ভবত সবচেয়ে মর্মান্তিক এবং বিভ্রান্তিকর প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি। 'অন্য'কে আমরা ঘৃণা করতে পারি এবং নির্মূল করতে পারি এমন ধারণাটি কি আমাদের ইতিহাসে সর্বদা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং ব্রিটিশরা আমাদের সংস্পর্শে এসেই কেবল পরিপূর্ণ করেছিল? আমি জালিয়ানওয়ালাবাগের ট্র্যাজেডির 100 তম বার্ষিকীতে এটি জিজ্ঞাসা করতে চাই যদি আমরা একটি সমাজ হিসাবে একটি ব্যবধান তৈরি করি যা ফাটল সৃষ্টি করতে পারে এবং আমরা আবার একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ বা মহিলার নির্দেশে উন্মত্ত আচরণের আদেশ পেতে পারি। আমরা কি আমাদের 'বাসুদেব কুটুম্বকম'-এর দর্শনকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং মিলগ্রামের পরীক্ষার বিষয়ের মতো হয়ে গিয়েছিলাম? আমার কাছে জালিয়ানওয়ালাবাগ কোনো বিভ্রান্ত, পাগল পাগল জেনারেলের কাজ নয় বরং একজন সাইকোপ্যাথের কাজ বলে মনে হয় যিনি ভারতীয়দের এই দুর্বলতাকে খুব ভালোভাবে জানতেন, যিনি আমাদের মধ্যে এই মানসিকতা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে যখন গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হবে, পুরুষরা থামবে না কারণ তাদের নিজের দেশের মানুষের আর্তনাদ তাদের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। এই দর্শন, অসুস্থ এবং বিপজ্জনক, সম্বোধন করা এবং বোঝার প্রয়োজন হতে পারে যা আমাদের একে অপরকে হত্যা করতে বা ধ্বংস করতে পারে। এটি কি আমাদেরকে একটি ঐক্যবদ্ধ সমন্বিত জাতিতে পরিণত করতে পরিচালিত করবে এবং আমাদের পিছিয়ে রাখবে না? 'অপরকে' তৈরি করা এবং তাকে শত্রুতে পরিণত করা অমানবিকতামূলক যা কেবলমাত্র প্রতীকী নয়, আমাদের দাস বানিয়েছে বরং আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান, আমাদের স্বাধীনতাকে হারাতে বাধ্য করছে। এটি আমাদের সেই শক্তি থেকে চিত্রিত করেছে যা একটি জাতি হিসাবে আমাদের অধিকার ছিল। গত বছর আমরা জালিয়ানওয়ালাবাগে গিয়েছিলাম। সেখানে শত শত মানুষ হাসছিল, কথা বলছিল এবং ছবি তুলছিল। কোন একক মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছিল না। কূপ বা দেয়ালে বুলেটের চিহ্নের দিকে তাকিয়ে কেবল কয়েকজনকে কৌতূহলী মনে হচ্ছিল। আমাদের ইতিহাস থেকে এই বিচ্ছিন্নতা কোথা থেকে আসে? দাসত্ব আমাদের ভারতীয়দের অমানবিক করেছে। আমরা ইতিহাস থেকে জানি, কোন গোষ্ঠীই পরার্থপরতার কারণে অন্যদের উপর তার বিশেষাধিকারগুলি হস্তান্তর করে না কিন্তু যখন তারা যে সুযোগ-সুবিধাগুলি উপভোগ করে তা তাদের বেঁচে থাকাকে হুমকির মুখে ফেলতে বাধ্য হয়। গান্ধী কখনই ব্রিটিশদের তা করতে পারেননি। শুধুমাত্র একবার আইএনএ ট্রায়াল এবং নৌ বিদ্রোহের সময়, এটি ঘটেছিল যখন একজন ভারতীয়কে 'অন্য' থেকে আলাদা করার ধারণাটি মুছে ফেলা হয়েছিল ব্রিটিশদের এই ভেবে যে এটি ভারতে তাদের ধ্বংস আনতে পারে। বর্তমান প্রজন্ম কি মুছে ফেলবে এই দাগ? এর মধ্যেই হয়তো নিহিত রয়েছে সেই

নিরাপত্তা যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সেই দ্বন্দ্ব থেকে নিরাপদ করে তুলবে যা আমাদের পূর্বপুরুষদের দাসত্বে ঠেলে দিয়েছিল এবং একে অপরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

Source: Rajat Mitra
Psychologist and Author of 'The Infidel Next Door'

আমার দেখা পুজোর রকমফের

মধুমিতা নাগ ঘোষ

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। বাংলায় ও বাংলার বাইরে, ভারতেরও বাইরে, যেখানেই গুটিকয়েক বাঙালী কাছাকাছি একসাথে বসবাস করেন, সেখানেই দেখা যায় দুর্গাপুজোর আয়োজন। এই উৎসব সবার। সব ধর্মের, সব ভাষাভাষী মানুষই এই উৎসবে শামিল হয়ে আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। এই বিষয়ে দীর্ঘ দিন গবেষণা করেছেন ও ইউনেস্কোর কাছে আবেদন করেছেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী তপতী গুহঠাকুরতা। অবশেষে ইউনেস্কো কলকাতার দুর্গাপুজোকে ভারতের "Intangible Cultural Heritage " বা "অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য" হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে সমস্ত বাঙালীর কাছে খুবই গর্বের ব্যাপার। কলকাতার পুজো এখন আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার সময়ে আমার মনে পড়ছে আমার জীবনে ছোটবেলা থেকে এই ষাটোর্ধ্ব বয়স পর্যন্ত দুর্গাপুজোর বিভিন্ন রকমফের।

দুর্গাপুজোর আমেজ বাঙালীর মনে ছেয়ে যায় মহালয়ার দিন ভোর থেকে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের উপস্থাপনায় "মহিষাসুর মর্দিনী" অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। যখন ছোট ছিলাম, মহালয়ার দিন ভোরবেলা বাড়ির সবাই উঠে পড়ত । আগের দিন রাতেই রেডিওটা ঘর থেকে বাইরে,

দালানে এনে প্লাগে আটকে রেডি করে রাখা হতো। আমার ঠাকুমা বোধ হয় রাত তিনটে-সাড়ে তিনটে নাগাদ উঠে পড়তেন। বাসি কাপড় ছেড়ে, মুখ-হাত ধুয়ে দালানে রেডিওর সামনে এসে বসে পড়তেন। ঐ অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই কাগজওয়ালা এসে পড়ত। সেদিন তার ঝুলিতে থাকত আমাদের এক বিশেষ আকর্ষণ---দেব সাহিত্য কুটীরের বাঁধানো মোটা পূজাবার্ষিকী বই। ব্যস, শুরু হয়ে যেত আমাদের পুজোর মজা আর দাদা-দিদির সাথে কাড়াকাড়ি করে নতুন বই পড়া।

ছোটবেলায় আমরা পুজোর সময় আমাদের হাজারীবাগের বাড়িতে যেতাম। ওখানে আমাদের বাড়ির কাছেই এক দুর্গাবাড়ি ছিল,সেখানে পুজো হতো ।ওখানে সর্বসাকুল্যে গোটা চারেক পুজো হতো । রামকৃষ্ণ আশ্রমে, রেল কোয়ার্টারে আর বাজারে। দুর্গাবাড়ির কাছেই একটা পুকুর ছিল, সেখানেই সব ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হতো।বিজয়া দশমীর দিন দুর্গাবাড়ির সামনে সাঁওতাল মেয়েদের নাচ হতো ,মেলার মত কয়েকটা দোকান বসত ।

আমি জন্মেছিলাম বালিগঞ্জ পাড়ায়। সেখানে বালিগঞ্জ প্রতিষ্ঠান বা দুর্গাবাড়ির পুজো ছিল আমাদের পাড়ার সকলের নিজের ও বিশেষ পুজো ।

যখন একটু বড় হলাম , তখন কলকাতার দুর্গাবাড়ির পুজোর মজা পেয়ে আমরা ভাই বোনরা আর হাজারিবাগ যেতে চাইতাম না , কলকাতাতেই থেকে যেতাম ।দুর্গাবাড়ির পুজোর আরেকটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল পুজোয় তিনদিন - সপ্তমী,অষ্টমী ও নবমীর রাত্রে নাটকের অভিনয় । শুনেছি ,ঠাকুর পাহারা দেওয়ার জন্য কয়েকজনকে মণ্ডপে রাত জাগতে হতো। এই রেওয়াজ প্রায় সব ক্লাবের পুজোতেই ছিল। দুর্গাবাড়ির কয়েকজন উৎসাহী ও নাট্যামোদী সদস্য স্থির করেছিলেন পুজোর রাত্রে পাড়ার ছেলেরা নাটক অভিনয় করবে আর তা দেখার জন্য পাড়ার অন্য সকলে মণ্ডপে ভিড় জমাবে। আমরা ও তাই সন্ধ্যাবেলা তাড়াতাড়ি ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে ,দশটা - সাড়ে দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরে , খেয়ে দেয়ে হাজির হতাম দুর্গাবাড়িতে নাটক দেখতে ।

সে সময় কলকাতার পুজোর সময় এত ভিড় হতো না ,আমরা একদিন বেরতাম , হেঁটে - একডালিয়া এভারগ্রীন, সিংহী পার্ক, ত্রিধারা, সমাজসেবী,বালিগঞ্জ

কালচারাল —এই সব ঠাকুর দেখা হতো । একদিন ট্রামে চেপে হাজরা মোড় পর্যন্ত গিয়ে, ভবানীপুরের ঠাকুরগুলো দেখা হতো — সঙ্ঘশ্রী, সঙ্ঘ মিত্র ,বকুলবাগান , ম্যাডক্স স্কোয়ার গোল মাঠ , নর্দান পার্ক –এই সব । আমরা ট্রামে চেপে পার্ক সার্কাস মোড়ে নেমে পার্ক সার্কাস ময়দানের ঠাকুর দেখতে যেতাম । সেখানে অনেক স্টল সাজিয়ে মেলা বসতো। সেখান থেকে মা - কাকিমারা টুকটাক জিনিস কিনতেন । আমরা ছোটরা হজমিগুলি কেনার জন্য আবদার করতাম । কখনো কখনো ঠাকুর দেখার ফাঁকে ,ফুচকা ,মশলামুড়ি , আইস্ক্রিম বা কোল্ড ড্রিংকস খাওয়া হতো ।সে সময় জুসলা কোম্পানির একটা পাইন আপেল জুস পাওয়া যেত , যেটা ছোটদের খুব পছন্দের ছিল । বাবা আমাদের সপ্তমী বা নবমীর সকালে অঞ্জলি দেবার পর উত্তর কলকাতার ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেতেন ।

বিজয়া দশমীর দিন দুর্গাবাড়ীর ঠাকুর বিসর্জন দিতে নিয়ে যাওয়ার পর আমরা পাড়ার ছোটরা , কয়েকজন বড় দিদি-পিসিদের নেতৃত্বে গড়িয়াহাট মোড়ে গিয়ে ঠাকুর দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতাম ।অনেক ঠাকুর ওখান দিয়ে ভাসান যেত তখন সেগুলো আমাদের দেখা হয়ে যেত।

এরপর যখন বড় হলাম, তখন বন্ধুদের সাথে ঠাকুর দেখতে যাওয়া, পয়সা জমিয়ে নিজেরা কিছু কিনে খাওয়া, এইসব করতাম। আমরা কলকাতায় থাকলে ,অষ্টমীর সকালে আমার মামার বাড়ির দেশ ,দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কোদালিয়া গ্রামের নেতাজির পৈতৃক বাড়ির পুজোয় যেতাম । পুরনো ঠাকুর দালানে মা দুর্গার পায়ে অঞ্জলি দিয়ে সকলে মিলে পাশের মূল বাড়ির একতলায় টানা বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত হতাম। সেখানে বাড়ির ও পাড়ার মহিলারা রান্না বান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। অষ্টমীতে সবাই লুচি খাবে ,তাই তাল তাল ময়দা মাখা হতো , আর আমরা ছোটরা বসে যেতাম লেচি পাকাতে । তারপর ঐ বারান্দাতেই মাটিতে আসন পেতে ,কলার পাতায় লুচি , ছোলার ডাল,বেগুনভাজা , আলুর দম – এই সব খাওয়া হতো । এখনো ওখানে পুজো হয় , অষ্টমীর দুপুরে সবাই মিলে খাওয়াদাওয়াও হয় ,কেবল এখন খাবারটা রান্না ও পরিবেশন করেন স্থানীয় এক কেটারার।

বিয়ের পর আমার শাশুড়ি মার বাপের বাড়ী, ভবানীপুরের "নতুন মিত্র" নামে পরিচিত পরিবারের বহু প্রাচীন পুজোয় অষ্টমীর দিন সন্ধিপুজোর সময় উপস্থিত থাকতাম। এই পুজো প্রায় তিনশো বছরের ও আগে থেকে ঐখানে হয়ে আসছে । বংশ পরম্পরায় বলা হয়ে থাকে যে , মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দী খাঁ ওই পুজো দেখতে এসেছিলেন। পুরনো এই বিশাল ঠাকুর দালান, আর তার সংলগ্ন নিচু খিলেনের বারান্দা ,পাতলা ইঁটের প্রাচীন গাঁথুনি মনে কেমন এক অপূর্ব ভাব জাগায়। তবে খুবই দুঃখের কথা , লক ডাউনের বছর থেকে এই পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার কেউ দায়িত্ব নিয়ে শুরু করবে কি না , কে জানে ।

এশিয়ান পেন্টস সংস্থা ১৯৮৫ সাল থেকে মণ্ডপ সজ্জার ওপর একটি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের আয়োজন করেন। শিল্পী , সাহিত্যিক , অভিনেতা , রাজনীতিবিদ , ক্রীড়াব্যক্তিত্ব প্রমুখ সমাজের কিছু বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী তৈরি করে তাদের রায় অনুযায়ী এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হলো । এরপর আরো নানান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও নানা ধরনের পুরষ্কার দেওয়া শুরু করেন । যার ফলে বিভিন্ন পুজো সমিতির মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা ও রেষারেষির মনোভাব গড়ে ওঠে । নিজেদের পুজোকে চিত্তাকর্ষক ও বিশিষ্ট করে তোলার জন্যে পুজো সমিতিরা নানা ধরনের " থিম " বেছে নিয়ে ,সেই অনুযায়ী মণ্ডপ ও প্রতিমার সাজসজ্জা করতে লাগলেন । ক্রমে ক্রমে এই থিমের পুজোর বিপুল ব্যয়ভার বহন করার জন্য পুজোর উদ্যোক্তারা বিভিন্ন

কোম্পানির কাছ থেকে স্পন্সরশিপ জোগাড় করে তাদের বিজ্ঞাপনে চারিদিক ভরিয়ে তুলতে লাগলেন । কলকাতার বিভিন্ন পুজোর বিজ্ঞাপন সারা শহরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বাংলা নতুন বছর পড়তে না পড়তেই। এই বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে শহরে মানুষের ঢল নামতে শুরু করে চতুর্থী - পঞ্চমী থেকেই । দর্শকের চাহিদা রাখতে প্রতিমার আবরণ তাই আগে ভাগেই খুলে দেওয়া হয় । বেশির ভাগ প্যান্ডেলে দর্শকদের সুবিধার জন্য বিজয়া দশমীর পরেও দু - তিনদিন ঠাকুর রেখে দেওয়া হয়। মহালয়া থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত আলোর মালায় সেজে উঠে কলকাতা সত্যিই হয়ে ওঠে "কল্লোলিনী তিলোত্তমা"।

অযথা ভেঙে পোড়োনা মা ... আমাদেরও ভেঙে পড়তে দিও না যেনো ...।

সৌরভ মজুমদার

২০২১ এর ফিজির দুর্গাপুজো ও বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন...
সংহতির বাতাবরণে এক অনবদ্য প্রয়াস এই কঠিন সময়ে

ছেলেবেলায় বাবার কাঁধের উপর চড়ে, ভিড়ের থেকে উঁচুতে উঠে ঠাকুর দেখেছি কত, দেখেছি উপর থেকে একদল আবেগী মানুষের স্রোত। বুঝেছি আর যাইহোক আমরা যেন সবাই কেমন একরকম, এই একরকম হয়ে বেঁচে থাকাটাই বোধহয় মিছিলকে, আবেগকে একই দিকে বয়ে চলার ইন্ধন দেয়। যখনি কেউ আলাদা হতে চেয়েছে, হয় সে লাইন ভেঙেছে, ভেঙেছে শৃঙ্খলা কিংবা নষ্ট করেছে আন্তরিকতা ও সাবলীল অভিব্যক্তি। আমাদের এই আলাদা হতে চাওয়ার চেষ্টা কি আমাদের নিজেদের একটা গন্ডি দেয়, দেয় কি একলার আকাশ কিংবা আড়াল, আভিজাত্য ও কৌলিন্য কি ভিড়ের চাপে দমবন্ধ হয়ে পরে, বৈষম্য কি একমাত্র পথ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার, না সহজ উপায়। এই যেমন দামি আসবাবে ভালোবাসার অভাব চোখে পড়েনা সংসারে, ঝাড়বাতির আলোয় হারিয়ে যায় সহজ চোখের তাকিয়ে থাকা, বাগানবাড়ির আড়ম্বরে হারিয়ে যায় একাকী শিউলি গাছটার অস্তিত্ব, তেমনি কি আভিজাত্যের প্রত্যাশা আমাদের সহজ সাবলীল বেঁচে থাকাকে আরো কঠিন করে দেয় নাকি, দেয় নাকি একরাশ জড়তা ও নকল আমির জন্ম।

আজও এতো যুদ্ধের পরও কি জোরে হাসতে গেলে চারিদিক দেখতে হয়, কিংবা কি ভীষণ লড়াই চালাতে হয় নিজেকে ভিড়ের বাইরে জোর করে টেনে বের করে আনতে। ঠিক কি আমরা চাই আমরা হয়তো সময় বিশেষে বুঝে উঠতে পারিনা, যেমন পারিনা বোধকরি সহজ হয়ে তালেতাল মিলিয়ে ঢাকের তালে নেচে উঠতে, আমাদের পথ রুখে দাঁড়ায় আভিজাত্যের ঠুনকো পোশাকি বেঁচে থাকা, কারোর পথ আটকে দেয় সামাজিক পরিচয়, কারোর পা আঁকড়ে ধরে বিভেদের আজন্ম পাঠ। কে বা করা বিষ ঢুকিয়ে দেয় শিশুটির মনে, নেমে আসে আচার ও বিধির চরম খাঁড়া, ঘিরে ধরে অনুকরণের অভিশাপ, মাঝে মাঝে আমার বাবার কথা মনেপড়ে বারবার, ছেলেবেলায় বাবা মনে করিয়ে দিতেন অনুকরণ কোরোনা, অনুসরণ করো। কিন্তু হায় এই মৃত্যু উপত্যকায় সমাজ যা নিদর্শন বুকে ধরে রাখে তাতো কেবলি ভাঙ্গনের ইতিকথা, ক্ষয়িষ্ণু চেতনার পরাকাষ্ঠা, হারানোর ইতিহাস। কাকে অনুসরণ করবো, সবাইতো কেমন যেন আত্মকেন্দ্রিক, নকল মুখোশ পড়ে নিজেদের আড়াল করে চলেছে রোজ রোজ, জোরগলায় বলতে পিছপা হচ্ছে, আমার সন্তান কিভাবে দুধে ভাতে থাকবে, তার প্রচেষ্টা কি কেবলি আমরা একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে ভাববো, বৃহত্তর স্বার্থের কথা কি কখনো ভাববোনা, এতোটুকুও কি সময় নষ্ট করবোনা নিজের অভীষ্ট উদ্দেশ্যের বাইরে, এই আত্মকেন্দ্রিকতা ও সংশোধনের সার্বিক উদাসীনতায় আমরা আজ আক্রান্ত, তাই অগোচরে আমরাই কি মিশিয়ে দিচ্ছি না কীটনাশক ধানগাছে, সমাজে। আমরা নিজেদের আলাদা করে রেখে প্রশ্ন করছি বারেবার, হয়তো আমাদের গন্ডি সীমিত, সমাজকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সীমিত, ম্রিয়মান চেতনার হাঁপরে বাতাস দিলেও তা দিয়ে লোহা গলানো যাবে না। এই আমরা আসলে মধ্যবিত্ত, চেতনায়, ভাবনায়, ক্ষমতায় মাঝারি এক শ্রেণীমাত্র, যাদের ইচ্ছা আছে কিন্তু সম্বল নেই। তাহলে এই শক্তি কোথা থেকে আসে, কে বা কারা "বিষাইয়াছে বায়ু" । আমরা কি সত্যি আমাদের শিশুর বাসযোগ্য একটা সমাজ গড়তে সক্ষম, না কেবলি বিনোদনের উপাদান খুঁজতে ব্যস্ত, পালিয়ে যাচ্ছি, নিতান্তই উপেক্ষা করে চলেছি ভিতরে ভিতরে একে অন্যকে আর মনের ভিতরে পুষে রাখছি অহংকার , পুষে রাখছি অহংকার, পুষে রাখছি

সেই আলাদা হয়ে ওঠার সকল কৌশল, আমরা কি সত্যি পারছি সাধারণ হতে, বৈভব ও সামাজিকতার জাল ডিঙিয়ে সাবলীল হতে। হায় এ প্রযুক্তি যা কি না বিভেদের পথ প্রশস্থ করছে মাত্র, মুঠোফোনে একে অন্যের জীবন মেপে চলেছি আমরা সর্বক্ষণ, চালিত হচ্ছি নকল বানানো ছবির মাধুর্য্যে, আসলে আর নকলে কি সব আসলের মতোই দেখায়, "বিস্ময় আজও গেলো না আমার,স্বপ্নে এখনো বুঝি যৌথখামার" পরিবার টুকরো টুকরো হচ্ছে রোজ রোজ, কোথাও কোনো আগ্রহ চোখে পড়েনা চেষ্টার, একের সাথে অন্যের জুড়ে থাকার প্রাবল্য। সন্তানের কীর্তি পরিবেশনে ব্যাস্ত সকলে, আড়াল করছি অক্ষমতা, শাসন করছি একা একা নিজেকে নিভৃতে। লোকচক্ষুর আড়ালে যে পৃথিবী গড়ছি আর যে পৃথিবী উপহার দিচ্ছি নিজের সন্তানকে তার স্থায়িত্ব নিয়ে আমরা কি নিশ্চিত, আমি কিন্তু খুব সন্ধিহান। চিরাচরিত প্রশ্ন গুলো কানে ভেসে আসে, 'অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ'। কিন্তু কে দেবে আলো আর কেইবা দেবে প্রাণ। আজও, এখনো আমরা বুঝি দাবার ঘুটির মতো হেটে বেড়াচ্ছি, পেয়াদা হয়ে অঙ্গুলিহেলনে ভেঙে ফেলছি বিশ্বাস, চিরকালীন অটুট ভরসার সৌজন্য, শান্তির বাসভূমিতে ছড়িয়ে দিচ্ছি বিষ, কি পাবো আর কি হারাবো এই বোধ প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে সমাজে, মৈত্রীর মধ্যে বা সম্প্রীতির মধ্যে যে একটা সারল্য আছে, আছে পাশে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি সেকথা ভুলে যাচ্ছি কেনো বারেবার, "সবার উপরে মানুষ সত্য" একথা অবহেলা করে তাহার উপরে কাকে বসিয়ে দিচ্ছি। আমার সব অঙ্ক নিমিষে জটিল হয়ে আসে, ক্রমশ ধূসর হয়ে যায় পান্ডুলিপি, আয়নার কাঁচ ঝাপসা হয়ে ওঠে, কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা আঘাত করে বারবার। মাঝে মাঝে ভাবী দুটো নদি পারলো একসাথে মিশে যেতে, দুটো সাগর পারলো আর কিছু মানুষ পারলো না এক হতে। মিথজীবতায় দুটো গাছ পারলো, দুটো প্রাণী পারলো আর দুটো জাতি পারলো না।

আমি আশা রাখি, জানি আমার ছাদের ছোট্ট টবে এতো বড় প্রকান্ড গাছ ফল দেবে না, তবু আমি রোজ জল দিই তাতে, প্রত্যাশার চোখে দেখি ভোর বেলায় রোজ রোজ, তাকে ভালোবাসি, যত্নে রাখি, সে কেবল আমায় আশা যোগায়, একদিন বুঝি সে ফল দেবে, দেবে ফিরিয়ে তার আনুগত্য।

আজ মহা দশমীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে, মা কে যেতে দিলাম ঘরে, মায়ের মুখ ডুবে গেলো অপেক্ষায়, আর আমাদের মুখ ভেসে উঠলো মায়ায়, আমরা রোজ রোজ আবার নিজেদের একটু একটু করে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেব, উৎসর্গ করবো, অসীম অপার প্রত্যাশায়।

কিছুটা সময় কাটলো এই পরবাসে, বেশ নিশ্চিন্তে, যেখানে নিজেকে আলাদা করে প্রমানের কোনো উৎসাহ সেভাবে চোখে পড়লো না কোথাও কারোর মধ্যে, চোখে পড়লো না ভিড়, আর আমার কাঁধে না চড়েই আমরা ছোট্ট ছেলেটা ও মেয়েটা মিশে গেলো ভিড়ে, আমি কখনো চাইনা ছেলেবেলা থেকে আলাদা হতে, এই সম্ভ্রম আমাকে একাকিত্ব দেয়, দেয় তফাৎ। আমি ভরসা রাখি সময়ে, আশারাখি, অনুভব করি যে নিজের গুনে মানুষ আদায় করে নিতে পারে ভালোবাসা, অর্জন করতে পারে স্নেহ, কৌলিন্য, প্রয়োজন পড়েনা কৌশলের, প্রথার বাইরে, ভিড়ের বাইরে থেকে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার কোনো প্রয়াস আমাকে আকৃষ্ট করেনা, তাই আমি আমার মতোই থেকে গেলাম এবারের মতো, আসছে বছরে যেন এভাবেই থাকতে পারি এই কামনায় এবারের মতো শেষ হলো পুজো, পুজো ধরা থাকলো আমার ছোট্ট মেয়েটার চোখে, সে চুপ করে বসে দেখলো সবই, আর কি বুঝলো সেটা হয়তো আগামী বছর আমরা বুঝবো, আমার ছেলে এবারে নিয়ম ভেঙে পাঞ্জাবি পড়লো দিন চারেক, বিস্ময়ে ও বিনা বকাবকিতে কাটিয়ে দিলো এই মরশুম। ও এবারে কাশফুল চিনলো, নিজে নিজেই স্বভাব বিরুদ্ধ নিয়মে এঁকে ফেললো

ওর চোখে লেগে থাকা মায়ের রূপ। বাড়িতে বাবা একটু লড়াই চালালো, মাও লড়ছে ক্লান্তি নিয়ে, যে যার মতো লড়াই করে আমরা সপরিবারে টিকে রইলাম এই বারের মতো। সৌজন্যে, বিনয়ে ও সৌহার্দ্যে গোটা কুড়ি জনকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করলাম আর খান কতক প্রণাম গ্রহণ করলাম, আমি বড় হচ্ছি টের পেলাম সাথে সাথে আমার পুঁচকে ছানা দুটোও বড় হলো, একটার চোখ একটু বড় হলো, আর একটার চোখ ফুটলো বোধকরি।

উৎসব আমাদের দেয় একটা চারণভূমি মাত্র, বদ্ধ জলাশয়ের নিস্তরঙ্গ জীবন থেকে দু-দন্ড ছুটি, নিজেকে আড়াল করার তাড়া নেই যেখানে, নেই প্রমানের প্রয়োজন। যাকিছু ঘটনা প্রবাহ চালচিত্রের মতো ভেসে বেড়ায় চোখের সামনে তার মধ্যে অনুভব করি যে আপাত ভাবে সবাই মিলেমিশে থাকতেই চাই আমরা, চাই কাঁধে কাঁধ রেখে আরো কিছুটা পথ চলতে, কি ভীষণ সহজ হয় বেঁচে থাকা যদি আমরা সবাই অযথা কোনো কারণ না খুঁজে একে অন্যের হাত ধরি, শক্ত করে হাত ধরলে আমি বিশ্বাস রাখি সে হাত, সে মায়া কাটিয়ে বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কঠিন।প্রতিযোগী হয়ে বাঁচলে কষ্ট বাড়ে, সহযোগী হলে সরলতায় ভোরে থাকে উঠোন।

আগামীতে, উঠোনে মা ঢেলে দিয়ো সুখ, শিউলির গন্ধে ও কাশফুলের স্নিগ্ধতায় আমাদের ছেলেমানুষই রেখো।

আবার কাঁধে চড়ে এসো, তোমাকে ভাঙার সাধ্য নেই কারো, তুমি শুধু অযথা ভেঙে পোড়োনা। আমাদেরও ভেঙে পড়তে দিও না... মা।

শুভ বিজয়া দশমী।

দুর্গা পূজার পৌরাণিক উপাখ্যান এবং বাংলায় দুর্গা পূজার ইতিহাস

সুদিপ্ত সাহা

বৃষ্টি শেষের রামধনুটা আকাশের ক্যানভাস এ রঙের আঁকিবুঁকি এঁকে বলে দিয়ে যায় বিদায় বর্ষা এবং তার সাথে জানিয়ে যায় শরতের অভিষেক। মনটা আপনাআপনি খুশীতে ভরে যায়, মা যে আসছেন। কি জানি কিসের টানে মনটা নেচে ওঠে, আকাশ বাতাস মধুর গন্ধে ভরে যায়। সে কি কাশফুলের গন্ধ? হবেও বা! বিজ্ঞানিরা বলেন কাশফুলের গন্ধ হয় না, কিন্তু তারা কি জানেন কাশফুল যে আনন্দধারা বয়ে নিয়ে আসে তার কোন বৈজ্ঞানিক বাখ্যা হয় না। শরতের নির্মল আকাশে পুঞ্জিভুত মেঘ যখন একটা অসাধারন কোলাজ তৈরি করে তখন মনের সব দুঃখ, শরীরের সব ক্লান্তি যেন এক মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। মনের মধ্যে বাজতে থাকে ধ্যাং কুরা কুর, ধ্যাং কুরা কুর বাদ্যি। উমা আসছেন, তাকে বরণ করতে হবে যে। সারা বছরের সমস্ত প্রতীক্ষার অবসান করে তিনি আসছেন। তাঁর বোধনে আমরা তৈরি হতে থাকি, আয়োজন করি শারদ উৎসবের। সে এক অনন্য আয়োজন তাতে নতুন পোশাক পরা আছে, মণ্ডপ সাজানো আছে, আছে দুর্গার পূজা, অঞ্জলি নিবেদন, আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিষ্টি-মুখ। এই ভাবেই দুর্গা পুজো আজ বঙ্গ-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আসুন সেই দুর্গা পুজো নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক, দেখে নেওয়া যাক দুর্গা পুজোর পৌরাণিক গুরুত্ব।

ভারত বর্ষ বেদ, পুরাণ, উপনিষদের দেশ। দেব দেবী, দৈত্য-দানব নিয়ে বহু গাথা বহুল প্রচলিত। এই গ্রন্থগুলিতেই একাধিক জায়গায় দেবী দুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায়। কখনও তিনি পার্বতী, কখনও ছিন্নমস্তা, কখনও চণ্ডিকা তো কখনও মহিষাসুর মর্দিনী। যুগে যুগে তিনি দেবতা, মনুষ্য ও অন্য জীবকুলের ত্রাত্রি। যখনি পৃথিবীতে দানবের অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করে গেছে তিনি অসুর ও দানব সংহার করে জীবকুলকে রক্ষা করেছেন। মহিষাসুরকে বধ করবার পূর্বে দেবীর আর দুটি রূপের উল্লেখ আছে।

দুর্গা : প্রচলিত ধারণা মহিষাসুরকে বধ করেছেন যে দেবী তাঁর নাম দুর্গা। সেটি মা দুর্গার অবশ্যই একটি রূপ কিন্তু দেবীর নামকরণ দুর্গা হয়েছে তার অনেক আগেই। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী দুর্গম নামে এক অসুরকে বধ করার ফলে দেবীর নাম হয় দুর্গা। মহিষাসুরকে বধ করে দেবী মহিষাসুরমর্দিনী নামে অভিহিত হয়েছেন।

অন্য মতে দুর্গা কথাটি এসেছে দুর্গ থেকে। দুর্গ শব্দের অর্থ একটি আবদ্ধ স্থান বা ঘেরা জায়গা। দুঃখ-কষ্ট, ভয়, শোক, জ্বালা, জন্ত্রনা যখন মানুষকে গ্রাস করে ফেলে তখন তিনি ভক্তকে এসবের হাত থেকে রক্ষা করেন, তাই তাঁর নাম দুর্গা।

শাকম্ভরি : পুরাকালে একবার পৃথিবী জুড়ে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তাতে না খেতে পেয়ে অজস্র মানুষ ও জীব মারা যান। তখন দেবী শাকম্ভরি রূপে অবতীর্ণা হয়ে তাঁর দেহ থেকে উৎপন্ন শস্য দিয়ে বিশ্বকে সুজলা-সুফলা করে তোলেন এবং পীড়িত মানুষ সহ সমস্ত জীবকুলের ক্ষুধা নিবারন ও প্রান রক্ষা করেন।

দুর্গার সৃষ্টি ও মহিষাসুর বধ : তখন মহিষাসুরের অত্যাচারে ত্রিভুবন অতিষ্ঠ, এই সময় মহর্ষি কাত্যায়ন সকলের মঙ্গল কামনায় ও রক্ষার্থে একটি বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেন। মহিষাসুরের কানে সেই যজ্ঞের খবর পৌঁছলে তিনি সেই যজ্ঞ পণ্ড করার জন্যে স্ত্রীলোকের বেশ ধরে সেখানে পৌঁছন এবং যজ্ঞের সমস্ত ঘী পান করে ফেলেন। মহর্ষি কাত্যায়ন তা দেখে বুঝতে পারেন যে স্ত্রীলোকটি আসলে ছদ্মবেশধারী মহিষাসুর। তখন তিনি মহিষাসুরকে অভিশাপ দেন যে কোন স্ত্রীলোকের হাতেই মহিষাসুরের মৃত্যু হবে। পরবর্তী কালে মহিষাসুর সংহারের সময় দেবী সিংহ-বাহিনী দশভুজা রূপে আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী থেকে নবমী তিথিতে মহর্ষি কাত্যায়নের পূজা গ্রহণ করে দশমী তিথিতে মহিষাসুর বধ করেন। এটিই দেবীর কাত্যায়নী রূপ।

অসুররাজ রম্ভার পুত্র মহিষাসুর। তার এরূপ নামকরণের কারন তিনি অসুর এবং মহিষ দুটি রূপই ধারণ করতে পারতেন। মহিষাসুর সিংহাসনে আরোহণ করবার পর অমরত্ব লাভের আশায় ব্রহ্মার উদ্দেশে তপস্যা শুরু করেন. ব্রহ্মা তার তপস্যায় তুষ্ট হলেও অমরত্বের বর প্রদান করতে অস্বীকার করেন এবং এই বর দেন যে কোন নারী ব্যতীত অন্য কেও তাকে বধ করতে পারবে না। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান মহিষাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে স্বর্গ দখল করেন এবং দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেন। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবতারা প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে ব্রহ্মা দেবাদিদেব মহাদেব ও নারায়ন বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন মহিষাসুর সংহার করার জন্যে। কিন্তু এখানে বাধ সাধে মহিষাসুরকে প্রদান করা ব্রহ্মার বর যার কারনে তিনি প্রায় অমর। এই সময় দেবতাদের স্মরণ হয় মহিষাসুরকে মহর্ষি কাত্যায়ন প্রদত্ত অভিশাপের কথা। তখন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সম্মিলিত তেজ থেকে সৃষ্টি হয় একটি দিব্য নারীমূর্তির যার দশটি ভুজা বা হাত।

দেবীকে সমস্ত দেবতারা তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্র যথা - শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, তরবারি, তির-ধনুক, ত্রিশুল, বজ্র, কুঠার, কমুনডল, অগ্নিশিখা, সর্প, ঘন্টা ও দণ্ডপ্রদান করেন মহিষাসুরকে বধ করার জন্যে। এছাড়া হিমালয় তাঁকে প্রদান করলেন তাঁর বাহন সিংহ। শঙ্খ প্রদান করেন বরুন, চক্র - নারায়ণ, গদা - যম, পদ্ম - নারায়ণ, তরবারী - কাল, তির-ধনুক - বরুণ , ত্রিশুল - মহাদেব, বজ্র - ইন্দ্র, কমুন্দুল - ব্রহ্মা, কুঠার – বিশ্বকর্মা, ঘন্টা – ঐরাবত। এর পর দেবী মহিষাসুরকে যুদ্ধে আহবান করেন এবং তাঁদের মধ্যে দশদিন ব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধের পর মহিষাসুরকে সংহার করেন।

পুরাণ অনুযায়ী দেবী মহিষাসুরকে মোট তিন বার বধ করেন – প্রথমবার উগ্রচণ্ডা রূপে, দ্বিতীয়বার ভদ্রকালি রূপে এবং সব শেষে দুর্গা রূপে। দ্বিতীয় বার বধ করবার আগে দেবী মহিষাসুরকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে জানান যে তিনি তাঁকে ভদ্রকালী রূপে বধ করবেন। তখন মহিষাসুর পরাজয় স্বীকার করে দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন যেন দেবীর সাথে সব সময় তিনি মানুষের পূজা পেতে পারেন। দেবী তখন তাঁকে আশীর্বাদ করেন যে উক্ত তিন রূপেতেই মহিষাসুর দেবীর সাথে পূজিত হবেন।

বাঙালীর দুর্গা পূজা – বাংলায় প্রথম দুর্গা পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। লোককথা অনুযায়ী মালদা ও দিনাজপুরের জমিদার এই পূজার আয়োজন করেন। অন্য মতে তাহেরপুরের জমিদার রাজা কংসনারায়ণ এবং নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদার ১৬০৬ খ্রিস্তাব্দে প্রথম শারদীয়ার আয়োজন করেন। কিন্তু ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ আগে অবধি এই পূজা জমিদার বাড়ি গুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেটা সার্বজনীন উৎসবের রূপ পেল ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে যখন হুগলীর গুপ্তিপাড়ায় ১২ জন বন্ধু মিলে স্থানীয় লোকেদের থেকে চাঁদা তুলে দুর্গা পূজার আয়োজন করেন। ইতিহাসে এই পূজায় বারো ইয়ারি বা বারোয়ারি পূজা নামে খ্যাত এবং আজ সার্বজনীন দুর্গোৎসবকে বারোয়ারী পূজা নামেই অভিহিত করা হয়ে থাকে।

কলকাতায় দুর্গা পূজা – কলকাতায় প্রথম দিকের দুর্গা পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ যখন রাজা নবকৃষ্ণ দেব শোভাবাজার রাজবাড়ীতে এই পুজোর পত্তন করেন। তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির রাজত্ব আর ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় বাবু শ্রেনির উদ্ভব হয়েছে। শোনা যায় যে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজ-উদ-দৌলা কে পলাশির যুদ্ধে পরাজিত করার পর লর্ড ক্লাইভ কলকাতায় বিশেষ সমারোহের আয়োজন করতে চেয়েছিলেন তখন রাজা নবকৃষ্ণ দেব তাঁকে শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজোতে আমন্ত্রন জানান। সেই পুজোয় ক্লাইভ সহ অনেক ইংরেজ আধিকারিক অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে এটা কলকাতার বাবুদের বাড়ির পুজোর স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে দাঁড়ায় যে কার পুজোতে কতজন কোম্পানির আধিকারিক অংশগ্রহণ করলো। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ানি প্রাপ্তি উদযাপন করতে এবং হিন্দু প্রজাদেরকে তুষ্ট করতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দুর্গা পুজোর আয়োজন করে। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ অবধী প্রতিটি দুর্গা পুজোয় ইংরেজরা বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ করতেন, তারপর ইংরেজ সরকার আইন তৈরি করে এই প্রথা রদ করেন।

কলকাতায় বারোয়ারী পূজা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারের জমিদার রাজা হরিনাথের হাত ধরে। হরিনাথ ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে দুর্গা পূজার প্রচলন করেছিলেন (সেই পূজা গত প্রায় দুশো বৎসর ধরে আজও সাড়ম্বরে হয়ে চলেছে)। তবে কলকাতায় সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ব্যাপ্তি ঘটে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে যখন সনাতন ধর্মোৎসাহিনি সভা বাগবাজারে এই পুজোর আয়োজন করে। ক্রমে দেশ স্বাধীন হয়েছে, হয়েছে বাংলার বিভাজন। সময়ের সাথে পুজোর ধরণ বদলেছে, বদলেছে প্রতিমার ধরণ। এখন তো বিশাল বিশাল মণ্ডপ এবং থিম পুজোর রমরমা কিন্তু দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালীর আবেগ-উদ্দীপণা একই রয়ে গেছে - যা চিরন্তন, যা বোধহয় বাঙালি হিসেবে আমাদের জাতির পরিচায়ক।

পৃথিবীর কিছু অদ্ভুত বাড়ি

সুদীপ্ত বর্মন

জাপানের দুর্গাপুজোয় লিখতে হবে কোনোদিন ভাবিনি। তবু আমার বান্ধবীর মেয়ের অনুরোধ ফেলতেই পারলাম না। গুরুগম্ভীর লেখা দিলে বেশিরভাগ কেউ পড়বে না এটা ভেবেই ঘাটাঘাটি শুরু করে দিলাম। শুর করে দিলাম একে ওকে জিজ্ঞেস করা। আমার এক আর্কিটেকচার বন্ধুর কথা হচ্ছিল; মুম্বাইতে তার বেশ নাম ডাক। মুম্বাইতে নানা ধরণের বাড়ির ডিজাইন তিনি করেছে তার ছবি দেখে ভালোই লাগছিল। কথায় কথায় উঠল যে আজকাল বাড়ি নির্মাণে অনেক ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আগেকার ধ্যান-ধারণাও ক্রমশ বদলে গিয়েছে। এখন সেইসব স্থাপত্য দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাই যারা এইসব করে তাদের কে কিন্তু প্রতিভাবান বলতেই হয়। ঠিক করলাম এইসব নিয়েই লেখা যেতে পারে। তাই সেইসব বৈচিত্র্যময় কয়েকটি বাড়ি নিয়ে লিখেই ফেললাম।

১। আপসাইড ডাউন হাউজ , পোলান্ড

নামটা শুনেই বেশ অদ্ভুত লাগছে না ?? আসলে দেখলে মনে হবে এটা একটা উলটো বাড়ি। উত্তর পোলান্ডের সিমবার্ক গ্রামে বেশ কয়েক বছরে পর্যটকদের ভীড় বাড়ছে। আর এই গ্রামের এক পাহাড়ের নীচে তৈরী হয়েছে এই বাড়ি। ছাদ মাটিতে আর মেঝে আকাশের দিকে। অনেকটা যাকে বলে পা উপরে আর মাথা নিচে। যিনি বানিয়েছেন তার নাম ড্যানিয়েল ফ্লপস্কি। পোলান্ডের মানুষ। কাঠ আর কংক্রিটের এই বাড়িটি। এই বাড়ি নির্মাণ করতে গিয়ে বেশ বিপদেই পড়তে হয়েছে ড্যানিয়েলকে। একবার বাড়ি নির্মাণ করতে গিয়ে দেখা গেল পুরো বাড়ির অর্ধেকের বেশি কাঁচামাল ভিত তৈরি করতেই চলে গেছে।

এছাড়া বাড়ির বাড়ির প্রতিটি দেয়াল, মেঝে আর ছাদের মধ্যকার সূক্ষ্ম কোণ, মাপ জোক করতে গিয়ে নির্মাণকর্মীদের প্রায়শ মাথা খারাপের জোগাড় হত। ফলে কিছুদিন পর পরই অনেক নির্মাণকর্মী কাজ বন্ধ করে চলে যেতেন। পরে আবার তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধরে এনে কাজ শুরু করানো হতো। ২০০৭ এ এটা তৈরী হয়। দুটো ঘর, মোট আয়তন ২০০ স্কোয়ার মিটার। ২0 জনের বেশি একসাথে বাড়িটিতে ঢুকতে পারবে না। বাড়ির ছাদের দরজা দিয়ে দর্শকদের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। বাড়ির ভেতরটা সাজানো হয়েছে পঞ্চাশ বছরের পুরনো পোল্যান্ডের বাড়ি-ঘরের আদলে। ছাদ দিয়ে হেঁটে চলে বেড়াতে হয়। মাথার ওপর মেঝে হওয়ায় সেখানে সাজানো রয়েছে টেবিল-চেয়ার, সোফা, খাট। এসব দেখতে দেখতে অনেক দর্শনার্থীর নাকি মাথা ঘুরতে থাকে। ফলে বেশি সময় বাড়ির ভেতরে থাকতে না পেরে অনেকেই বের হয়ে আসেন।

২। ভিয়েতনামের ক্রেজি হাউস

ভিয়েতনামের এই বাড়ির কথা কিন্তু একেবারে রূপকথা। ১৯৯০ সালে এটা তৈরী হয়। আর কোথায় জানেন? শহরের নামটা ভারী সুন্দর- দ্য লাভ. তবে এটা কিন্তু ঠিক থাকার জন্য বাড়ি নয়। আসলে এটা একটা হোটেল। যিনি আর্কিটেক্ট তার নাম ড্যাং ভিয়েত না। কাঠ আর কংক্রিটে তৈরি এই বাড়ির নাম দেন 'ক্রেজি হাউজ'। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, এটি যেন এক পাগলা স্থপতির এক গোলমেলে বাড়ি।

দূর থেকে দেখলে কিন্তু একে হোটেল বলে মনে হবে না। মনে হবে একটা গাছ যেন ডালপালা মেলেছে। আর তার ডালপালা ছড়িয়ে আছে হোটেলের ঘরগুলিতে। হোটেলে খোলা জায়গায় অনেক বেশি। এই ব্যাপারে যিনি আর্কিটেক্ট তার মত হল প্রকৃতিকে আগে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, তারপর নির্মাণ। হোটেলের দরজা-জানালা নির্দিষ্ট কোনো আকারের নয়। ঘরের আকারও তেমন। এবড়ো থেবড়ো। ছাদের আকৃতিও সমান নয়। সেখান দিয়ে গাছের ডালপালা আর শিকড় নেমে এসেছে। পুরো হোটেলের চারদিকে কাঠের তৈরি নানা ভাস্কর্য। বড় বড় গাছের মোটা মোটা গুঁড়ি কেটে সিঁড়ি তৈরি হয়েছে।

হোটেলের প্রত্যকে ঘরকে এক একটি প্রাণীকে থিম করে বানানো হয়েছে। বাঘ, সিংহ, হরিণ এমনকি পিঁপড়েও এসেছে এই ভাবনাতে। কেমন শুনবেন?? বাঘের ঘরে ঢুকলে মনে হবে লাল বড় বড় চোখ করে বাঘ যেন বিছানার দিকে থাবা বাড়িয়ে আছে। বিছানায় কেউ এসে বসলেই তার ওপর হামলে পড়তে প্রস্তুত সে। আবার যেটা পিঁপড়ে ঘর, সেখানে মনে হবে যে ঘরের অনেক অংশে পিপড়েরা জুড়ে আছে, এই বোধহয় কামড়ে দেবে।

এটা যখন শুরু হয়, তখন তো ভিয়েতনামের লোকেদের একদম না পসন্দ ছিল, পাগলা স্থপতির এই পাগলামিকে অনেকেই ভালোভাবে নেয়নি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই হোটেল। হয়ে ওঠে ভিয়েতনামের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। প্রতিবছর প্রচুর পর্যটক আসতে শুরু করে এই বাড়িটি

দেখতে। পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্থা থেকে এই নকশার জন্য পুরস্কৃত করেছে। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, স্থপতি দাং মনে করেন, এই বাড়ির নির্মাণকাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি। নতুন কোনো চিন্তাভাবনা তার মাথায় এলেই সেটিকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য নেমে পড়েন এই ৭৫ ছুঁই ছুঁ এই স্থপতি।

৩। ড্যান্সিং হাউজ, চেকোস্লোভাকিয়া

দেশের রাজধানী প্রাগে এই বাড়ি তৈরী হয়েছে যা আজও সারা পৃথিবীতে এক বিস্ময়। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় বোমার আঘাতে এই শহরের ভলটোভা নদীর ধারে অনেক পুরনো বাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়। বাড়ির মালিক ও আর্কিটেকট রা সেগুলো ভেঙে সেই জায়গায় এক নতুন কিছু তোরী করতে চাইলেন। চেনা কাঠামো থেকে বের হয়ে এসে নতুন কিছু করার ভাবনা থেকে কাজ শুরু হলো। ১৯৯২ সালে বাড়ির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তবে কাজ শুরু হতেই এর নির্মাণ নিয়ে শুরু হলো বিতর্ক। শেষ পর্যন্ত চেক প্রেসিডেন্টের ইচ্ছায় ১৯৯৬ সালে এই বাড়ির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। মোট

নয় তলা বাড়ির পুরোটাই হোটেল আর রেস্তোরাঁ। দুটো তলা মাটির নিচে। মোট ৯৯টি কংক্রিটের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি হয়েছিল এই বাড়ি।

প্রথমদিকে চেক প্রজাতন্ত্রের দুই জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পীর নামানুসারে বাড়ির নামকরণ করা হয় ‘ফ্রেড অ্যান্ড জিঞ্জার’। পরবর্তীকালে বিশ্বের মানুষের কাছে এই সুন্দর অদ্ভুত বাড়িটি ‘ড্যান্সিং হাউজ’ নামেই সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করে। দেশটির মুদ্রায়ও এই বাড়ির প্রতিচ্ছবি ব্যবহার করেছে সে দেশের জাতীয় ব্যাংক।

৪। হবিট হাউশ, ওয়েলস

হবিট সিনেমাটা দেখেছেন?? বামন জাতির গল্প। এই রূপকথার গল্পের হবিটদের বাড়ির আদলে এক পাহাড়ের নীচে প্রকৃতির মাঝে তৈরী হয়েছে এই হবিট হাউস। আমরা বিল না কোনো কথা হবে, ঠিক সেই রকম বলা যাতে পারে এর নির্মানকার্য দেখে। বাড়ির নকশা এবং নির্মাণকাজের সাথে জড়িত ছিলেন স্বয়ং বাড়ির মালিক সাইমন ডালে। একটি পরিবেশবান্ধব বাড়ি নির্মাণ করার ইচ্ছা থেকেই তিনি এই বাড়িটি নির্মাণ করেন।

পাথর, মাটির দেওয়াল আর ঘাসের ছাদ দিয়ে তৈরি এই বাড়িটার নকশা আর ঘরের ভেতরের দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামো এককথায় অতুলনীয়। বাড়ির কাছেই বেশ কিছু ঝর্ণা থাকায় বাড়ির চারপাশের পরিবেশকে করে তুলেছে আরও দর্শনীয়। বাড়ির ভিতরে কোনো কৃত্রিম বা বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এমন ভাবে বাড়িটা তৈরী করা হয়েছে যাতে দিনের বেলায় সূর্যের আলো বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। আর রাতের বেলায় সোলার প্যানেলের সাহায্যে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারা পৃথিবীতে এটা ইকোফ্রেন্ডলি বাড়ি বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

Bipasha Dutta

Agnimitra Saha

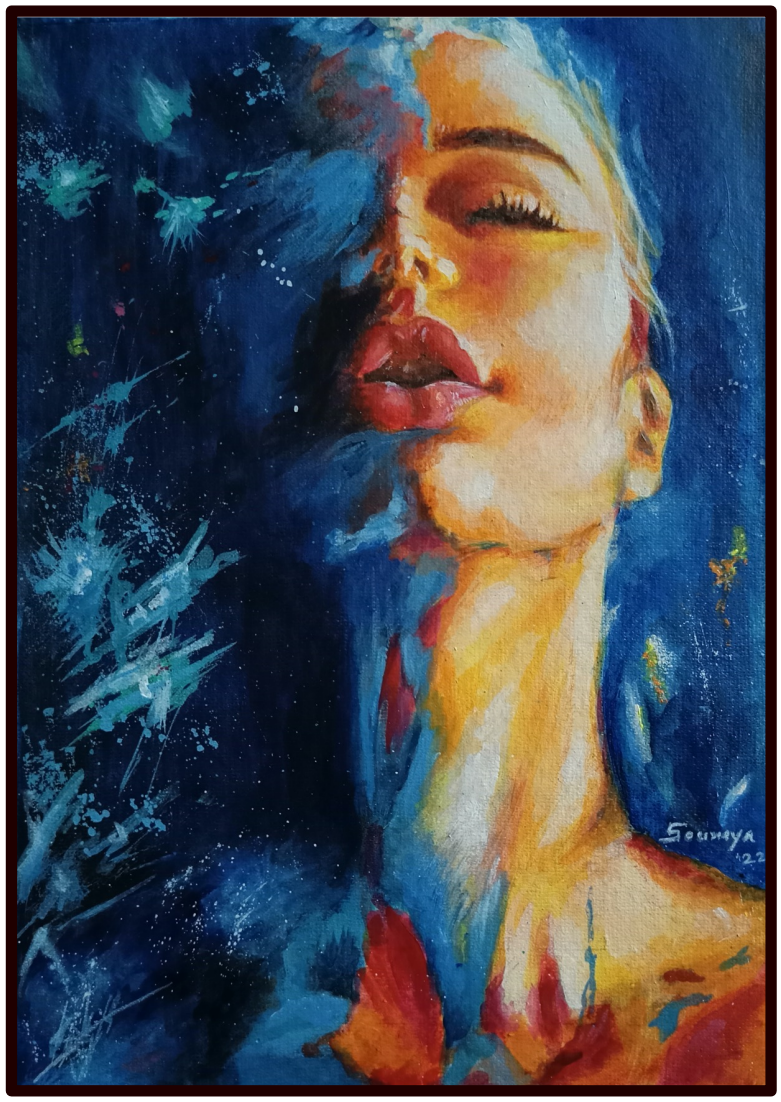

Soumya Bhattacharjee

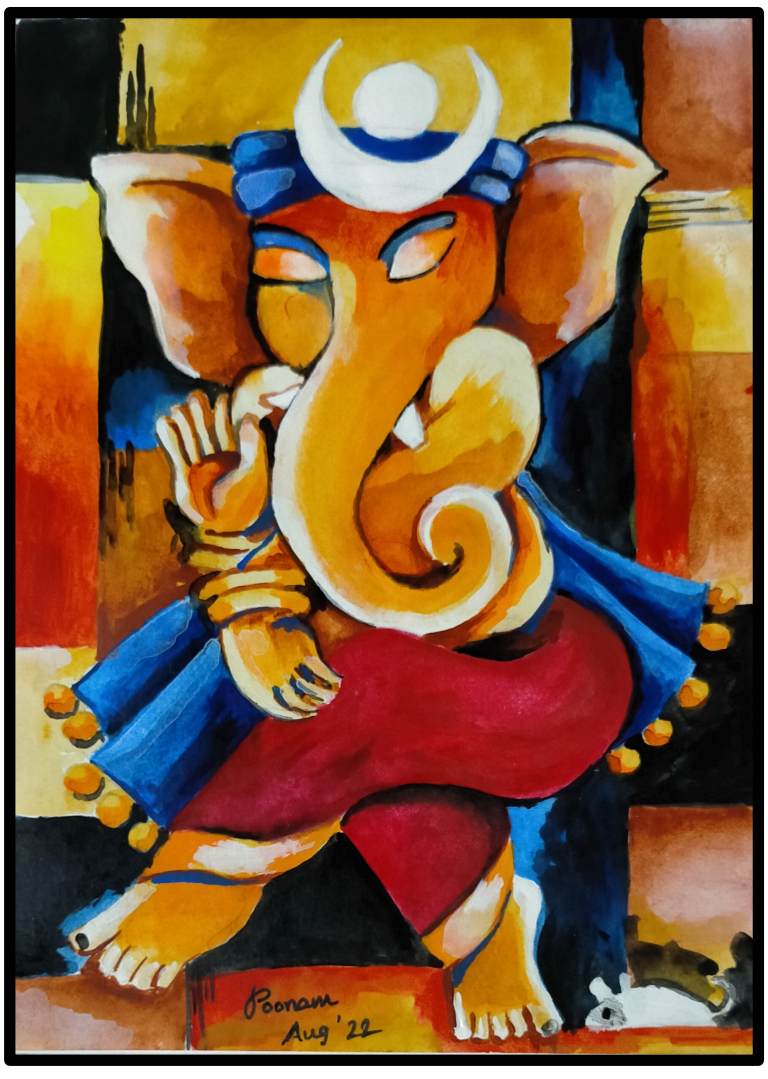

Poonam Mandal

This is a Mithila Painting. This particular style of painting belongs to Bihar State. It is a folk painting. This picture depicts Radha Krishna in Vrindaban. The special characteristics of this picture is the work of "Kachni" style. This picture has expressed in the style of Mithila Painting. The painting has been done in handmade paper in acrylic colour.

Soma Halder

Dr. Sudipto Banerjee

Enakshi Misra

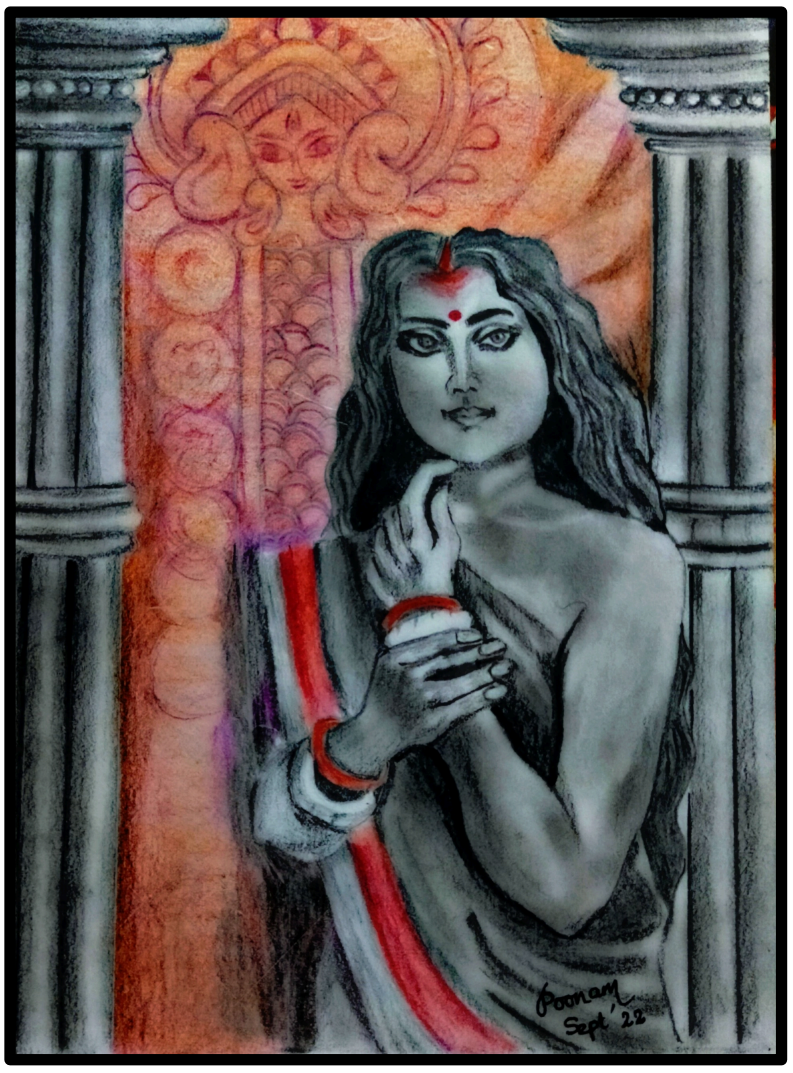

Poonam Mandal

Perennial

I let go of my darkness
I embrace the light
My shadows are my wings
It's time to take flight

I soar above my demons
Break the shackles of my strings
Soar unto my Own
Boundless celestial being

I come home to innocence
I come home to rest
Rekindle the embers of my essence
Till the flames lick the air in zest

In that white hot flame
I find you with open arms
For I have come from You
And to you I'll always return.

- by Sukanya Misra

This idol of Durga is inspired by our constant dance between light and shadow, our countless doubts in the shades of grey, the cyclic continuity of our existence and timeless purity and heritage of the art of shola.

Made by a combination of cutting paper with a blade and modelling “paper clay”.
Height: 40cm

ভালো থাকতে দিলে কই

সুব্রত সেনগুপ্ত

তিনরাস্তার মোড়ে সকালে হটাৎ অবনীর সঙ্গে দেখা
জিজ্ঞাসা করলাম, অবনী ভালো আছো?
একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আনমনে বলল
ভালো থাকতে আর দিলে কই?
তারপর চোখের নিমেষেই যেন মিলিয়ে গেল অবনী
অনেক খুঁজেও পেলাম না তাকে আর।
ইলেসেগুড়ি বৃষ্টিতে অল্প ভিজে
বাড়ি ফিরতে একটু বেলাই হয়ে গেল
জলখাবারের সঙ্গে চা খেয়ে
একটা সিগেরেট ধরিয়ে ভাবতে থাকলাম
কেন এমন হলো?
চিন্তা গুলো জটিল হচ্ছে আস্তে আস্তে
' ভালো থাকতে আর দিলে কই?'
'ভালো থাকতে আর দিলে কই?'
তীব্র হচ্ছে, তীব্রতর হচ্ছে প্রশ্নটা
কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে
যন্ত্রনায় অচ্ছন্ন হচ্ছে মস্তিস্ক
মাটি চাঁপা একটা কষ্ট বুকের ভিতরে
বেশ বুঝতে পারছি চোখ বুজে আসছে
আস্তে আস্তে নিদ্রাচ্ছন্ন আমি
তবে কি কেউ ভালো নেই?
জলফড়িং, ইচ্ছে ডানা, মেঘবালিকা, অবনী কেউ না?
বিকট একটা গ্লানি, হতাশা, পাপবোধ
কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে সারা শরীর, সমস্ত মন
আচ্ছা কবে থেকে হোলো এমনটা?
ভালোই তো ছিলো সবাই
জলফড়িং, ইচ্ছেডানা, মেঘবালিকা, অবনী সবাই সক্কলে
না কি সবটাই ভুল ছিলো, মেকি ছিলো
উফ কেন এমন হোলো, কবে থেকে হোলো এমনটা
এই ঠিক না থাকাটা ঠিক কবে থেকে
গুলিয়ে যাচ্ছে, সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে
আচ্ছা মহাভারত, মহাভারত কি বলে?
অমৃতসমান মহাভারত কি বলে
তখন কি সব ঠিক ছিলো, ভালো ছিলো সব?
বাসুদেব তো আসলে একটা ধর্মযুদ্ধ চেয়েছিলো
কিন্তু যুদ্ধ টা কি আদপে ধর্ম মেনে হয়েছিল?
গুলিয়ে যাচ্ছে সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে
কুরুক্ষেত্র, পাশাখেলা, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, জতুগৃহ কোনটা,
কোনটা ধর্ম মেনে হয়েছিল?
কর্ণ, মহাবীর কর্ণ শুধু মাত্র পিতৃপরিচয় চেয়েছিলো
সেটুকুও পাই নি বেচারা
কৃষ্ণা তো শুধু ফাল্গুনী কে ভালোবেসে, ভালো থাকতে
চেয়েছিলো তাও তো হোলো না, আসলে ভালো থাকাটাই
হোলো না
' যদা যদা হি ধর্মস্য, গ্লানির্ভবতী ভারত
অভুর্থনাম ধর্মস্য, তদাতনং সৃজামহ্যম
পরিত্রাণায় সাধুনাং, বিনাশয়া চ, দুষ্কৃরতাম,
ধর্মসংস্থাপ্রণার্থয়া, সম্ভবমী যুগে যুগে '
ধর্ম স্থাপন কি আজও হোলো?
সেই তো গ্লানি আর গ্লানি
গ্লানির্ভবতী ভারত
চরম একটা কালো গ্রাস করছে আমাকে
অসহ্য দলা দলা কান্নায় বুজে আসছে গলা
কানে শুধু বেজে চলেছে একটাই কথা
ভালো থাকতে আর দিলে কই?
ভালো থাকতে আর দিলে কই?

ইচ্ছা

সুব্রত সেনগুপ্ত

এই শরতে দিগন্ত হোক, ভালোবাসার
এই শরতে বাজুক সানাই, বিসমিল্লার
এই শরতে হেমন্ত রোদ, দৃপ্ত থাকুক
এই শরতে মেঘমল্লার, অঙ্গে বাজুক
এই শরতে সব ভালো তার, দোসর খুঁজুক
এই শরতে ধাই কুর কুর, ছন্দ থাকুক
এই শরতে প্রজাপতি, পাখনা মেলুক
এই শরতে রামধনু রং, আশায় দুলুক
এই শরতে অন্য কিছু, অন্য সুর, আর অন্য ছড়া
এই শরতে বেনিয়মের নিয়ম দিয়ে , হোক না অন্য ভুবন গড়া
এই শরতে শিরদাড়া সব, শক্ত থাকুক
এই শরতে মননগুলি পুন্য করার, স্বপ্নে বাঁচুক
এই শরতে শপথ থাকুক, গীতবিতান
এই শরতে মনুষ্যত্বের, হোক উদযাপন

নরক

প্রত্যূষা সরকার

একটা চুরমার হওয়া পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি
স্লোগান বলছে, যুদ্ধ চাই

কয়েকশো ক্রোশ দূর থেকে এগিয়ে আসছে অন্ধকার
আমি অন্ধকারকে সাদা হতে দেখছি, রক্তকে কালো
বেমালুম পুড়তে পুড়তে নরক হয়ে যাচ্ছে মানুষ

মানুষ পুড়তে পারে!
মানুষ বেঁচে বা না বেঁচে দুভাবেই পুড়তে পারে

কয়েকটা চাঁচাছোলা জিভ তেতো ভাষণ দিচ্ছে,
ওরা ক্লান্ত, ওদের জল দাও

একটা চুরমার হওয়া হৃদপিণ্ড নিয়ে বাথরুম-ঘর, ঘর-বারান্দা
একটা মুচড়ে যাওয়া হাত, দুটো ভোঁতা হওয়া চোখ
ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলছে
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কবি উঠে দাঁড়াচ্ছেন, আবার বসে পড়ছেন
গড়িয়ে পড়ছেন দুমদাম শব্দ সমারোহে

পৃথিবী যুদ্ধ করছে, চুপ চুপ...
ভুলে যেতে হবে মানুষ-জন্ম
খিদের কাছে চোখ কচলে বলতে হবে, উই শ্যাল ওভার কাম

বিন্দু বিন্দু ঘাম থেকে স্বাধীনতা খসে পড়ছে
তড়বড়িয়ে,
শুধুমাত্র মানুষের বাচ্চাই জানে,
পৃথিবীতে ক্ষমার থেকে ভাতের চাহিদা অনেক বেশি

তেরো পার্বণ

ভাস্কর দেব

চলে গেছে সেই ছেলেবেলা
দেখতে যেতাম চড়কমেলা
পিঠে বঁড়শি বিঁধিয়ে চারটি লোক
ঘুরছে দেখি ভূলোক দ্যুলোক
তালে তালে ঢাক ঢোলক বাজে
বাবা তারক নাথের চড়নে সেবায় লাগে
কোরাস কণ্ঠতে আওয়াজ আসে
এখন ভাবলে এসব অবাক লাগে
খেতাম বাদাম ভাজা পাঁপড় ভাজা
হোতো জে না কতই মজা
এই দিনগুলি কি আর আসবে ফিরে ?
সবি আছে স্মৃতি ঘিরে
বিদেশ ভুঁইইয়ে নাইরে এসব

বারো মাসে তেরো পাবন
কখন যে জায় আষাঢ় শ্রাবণ
ধরে কি আর রাখে এমন
আশ্বিনের মাঝা মাঝি
উঠিবে বাজনা বাজি
দুর্গা পুজার কেনা কাটা
নতুন সাজে সবাই সাজি
দুর্গা পুজা শেষ হতে না হতে
ঠিক পেছন পেছন লক্ষ্মী আসে
তার পরেতেই কালি পূজা
চারি দিকে আলয় ভাসে
তার পরেতে আসেন,মা জগদ্ধাত্রী
কাটে ওনাকে নিয়ে কয়েক রাত্রি
কার্ত্তিক ও প্রায় সঙ্গে আসে

সবাই কয়েক দিনের সহযাত্রী
বারো মাসের তেরো পার্বণ
বাংলার এই রীতি
যাদের কথা নেই এখানে
তাদের প্রতি রইলো আমার
শুভেচ্ছা ও প্রীতি।।

বৃষ্টি পড়ে
অঞ্জন বর্মন

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
আমাদের এই গোপন ঘরে
অক্লান্ত মৃদুস্বরে
বিসর্জনের বাজনা বাজে
হঠাৎ ঝড়ে
প্রত্যাশাতে আগুন ধরে
বৃষ্টি পড়ে

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
কর্পোরেটের রেলিং ধরে
হাইরাইজে দেদার ঝরে
ফেরার পথে থই থই ঘুম
আঁচল ধরে

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
রোদ ভরা মুখ উঠোন ভরে
ফুলাঞ্জলি যুক্ত করে
হাত ধরে নেয় আলতো টানে
লজ্জানত চোখের ‘পরে
বৃষ্টি পড়ে

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
শিলার আঘাত ক্ষতস্থলে
ভাঙছে ডানা পঞ্চশরে
অভিমানে ফেরায় না মুখ
চোখের পাতা মৃদু নড়ে
বৃষ্টি পড়ে

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
মহাকালের অসীম স্তরে
শব্দভ্রূণ কোন আখরে
ফুটতে গিয়ে হঠাৎ ঝরে
বৃষ্টি পড়ে

ছড়া - আগমনী
শ্রাবণী ঘোষ বসুমল্লিক

বাজল ঢাকের বাদ্যি
ফুটল শিউলি, কাশ
আগমনী সুরে
মাতল আকাশ, বাতাস।
মা আসছেন মর্তধামে
সঙ্গে স্বামী, পুত্র
কন্যা দুজন আসছে সাথে
আহা! কি আনন্দ।
শরতের এই নীল আকাশে
সোনা রোদের খেলা
তারি মাঝে ভাসছে দেখো
সাদা মেঘের ভেলা।
নতুন জামা, নতুন জুতো
আরো কত কিছু
মায়ের পুজোয় সবাই মাতে
বড়, ছোট, শিশু।

তুই যে আমার
নূপুর মুখার্জি

তুই যে আমার এক চিলতে পেঁজা তুলির আকাশী আকাশ।
তুই যে আমার হঠাৎ আসা বুক ভরা প্রশ্বাস।
তুই যে আমার ছোট্ট বকুল ফুলের সুবাস।
তুই যে আমার রঙিন স্বপ্ন দেখার আশ্বাস।
তুই যে আমার সেই মৌমাছি দের ফুলে ফুলে মধু খাবার উচ্ছ্বাস।
তুই যে আমার সকাল বেলার নতুন রবির লাল কিরণের একরাশ রক্তিম আভাস।
তুই যে আমার মনের মাঝে লুকিয়ে রাখা এক ঝাঁক বিশ্বাস।
তুই যে আমার অন্য পৃথিবীর সময় পারানির অবকাশ।
তুই যে আমার কি তা এক পৃথিবীর মাঝে থাকতে থাকতে দুজন দুজনকে অনুভব করতে পারবি
তা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।।

ভাবছে ওরাও
সৌরভ দেবনাথ

সকাল বেলায় উঠে দেখি
আকাশটাকে লাগছে মেকি
মেঘটা যেন পড়ছে খ'সে
জমছে ভীষণ অন্ধকার!
শুনছি নাকি হচ্ছে ভোট
চাঁদ-তারারা বাঁধছে জোট
সূর্য আছে আশায় বসে
ধূমকেতু উল্কার!

জলের ভিতর যাচ্ছে দেখা
অক্টোপাস হাঁটছে একা
কুমিরগুলো ডিজিটালে
ছাপছে রঙীন ইস্তেহার।
মাছেরা সব গড়ছে দল
কাঁকড়া ঝিনুক করছে ছল
তিমিও আছে নিজের তালে
ভাসছে গদি স্বপ্নে তার।

বনের রাজা সিংহ ভাবে,
চেয়ার-টা কি এবার যাবে?
রাশটাকে না ধরলে কষে
থাকবে না আর রাজ্যভার।
বাঘ ভালুকে ফন্দি আঁটে
এগাছ ওগাছ নোটিস সাঁটে,
নেকড়ে হরিণ পাশে বসে
করছে শলা বারংবার।

মানুষ বলে, ওরেব্বাবা!
জানল কবে ওরাও দাবা,
আঁকল রেখা বাইরে যে-যার
শিখল কুটিল রাজনীতি?
পড়তে এবার হবে ফাঁদে
সবাই যদি জটলা বাঁধে,
করবে ওরাও অত্যাচার-
ছল-কপট আর দুর্নীতি।

প্রিয় নির্জনতা বুকে এসো
শুভা দত্ত

অক্ষর বুনে বুনে কবিতার পাহাড়
জমেছে
ঠাস বুনন পৃথিবীর বুকে কালো অক্ষরের
দামামা -
তবু শব্দের আহ্বান -
অক্ষরের বন্দনা - বিন্যাস
বিষন্নতার ভেলায় চড়ে
এমাথা থেকে তেমাথা
খুঁজে মরা - না-লেখা তরঙ্গের
আর্তি
চোরা স্রোতের এ মনউজানে
একভাবে দাঁড়টানা।
ধোঁয়া রঙ, প্রিয় নির্জনতা বুকে এস
ক্লোরোফিল টানি।।

পুজোর গন্ধ
শুভজিৎ মুখার্জী

রোজকার মত হাঁটতে বেরিয়ে ট্রামটা দেখে পথঘাট
আজ খুব সুখী
এপাশে খুব বুড়ো দুটো বাড়ী গলাগলি করে আলোর
মালা পড়েছে
মানুষের ব্যস্ত মুখগুলো হঠাৎ করেই খুব
আলোকময়।
যান্ত্রিক ক্লান্তির পোশাকটা পকেটে রেখে গোটা শহর
যেন খুশির নতুন জামা পরে রাত জাগার তোড়জোড়
করছে
সবই বদলায়, শহর, পরিবেশ, মানুষজন।
শুধু শিউলি, ছাতিম আর পূজো পূজো গন্ধটা বদলায়
না

Mahishasur Mardini
By Dr Sudipto Banerjee

Behold the fields where catkins sway
To kill Mahishasur, Devi Durga on her way.

The dewy freshness of the Autumn dawn
Mother dances with Bhairav raag on the lawn.

A raft of white clouds floating in the sky
Nyctanthes fragrance invites bees - butterfly.

Asuras are the pollutants of the pure Nature
Divine Mother slays the depraved odious creature.

Nature celebrates the Victory with vibrant autumnal hues
It is festive time - devotees have a purpose to enthuse.

"Kallolini Tilottama" embellished with colours and lights
Prepared to worship the Goddess for full Nine nights.

Cities are filled with fun - loving shoppers
Crowd of people gushing out as pandal hoppers.

Selfies galore with pleasurable sensation of foodgasm
People everywhere with zealous fervour and enthusiasm.

Kallolini Tilottama is the name assigned to Kolkata (city of Joy)

"নাম ভুলে গেছি, দুর্বল মেধা
স্মরণে রেখেছি মুখ;
কাল রজনীতে চিনিব তোমায়
আপাতত স্মৃতিভুক।

ডাকিব না প্রিয়, কেবলি দেখিব
দু'চোখে পরান ভরে;
পূজারী যেমন প্রতিমার মুখে
প্রদীপ তুলিয়া ধরে।

তুমি ফিরে যাবে উড়ন্ত রথে
মাটিতে পড়িবে ছায়া,
মন্দির খুঁড়ে দেখিব তোমায়
মন্দ্রিত মহামায়া।

ভুলে যাব সময়-নিপাতে
স্মরণে জাগিয়ে প্রেম,
আঁধারে তখন জ্বলিবে তোমার
চন্দনে মাখা হেম। ”

-নির্মলেন্দু গুণ

পুজো আসছে
শুভজিৎ মুখার্জী

পুজো আসুক সবাই হাসুক দুর্গা আসা।
পুজো মানেই নতুন কাপড় জামা,
হরেক রকম মন মাতানো আহার।
পুজো মানেই দেয় বুকে সুখ হামা,
রং ঝলমল দারুণ সাজের বাহার।
পুজো মানেই লম্বা টানা ছুটি,
বই খাতা পেন সটান শিকেয় তোলা,
পুজো মানেই আলোয় লুটোপুটি ।
পুজোর মজা যায় কি কখনও ভোলা?
পুজো মানেই শিউলি সুবাস ভাসে,
নদীর জলে শাপলা শালুক হাসে ।
পুজো মানেই বাতাস নাচে কাশে,
রোদ চুমু দেয় শিশির ভেজা ঘাসে ।
পুজো মানেই সুখের সাগর বুকে,
দল বেঁধে রাত জেগে ঠাকুর দেখা ।
পুজো মানেই শুকনো মলিন মুখে
কোথাও যেন কেউ থাকেনা একা,
পুজো মানেই খুশির প্রহর গোনে,
সবুজ অবুঝ ছোট খোকাখুকি।
পুজো মানেই সবার মনের কোণে,
সুখের সূর্য খুশিতে দেয় উঁকি ।

পুজো মানেই ক্লান্ত আধাঁর কালোর,
পেরিয়ে আসুক ঝলকি আশার আলোর ।
পুজো মানেই পাহাড় বিঘ্ন বাধার,
সরিয়ে আসুক সুদিন সবার ভালোর ।।

আবার এসো মা

সুচেতনা

আনন্দের সুর বইছে ভুবনে,
উমা এলো আজ নতুন বেশে।
বোধনের সুরে ডাকছে দেখো,
ষষ্ঠীর প্রাতে নতুনের সাজে।
বাজলো শাঁখ, কাঁসরের ধ্বনিতে,
মাতলো রে সবাই খুশির জোয়ারে।

সপ্তমীর সাজে পাড়ার প্যান্ডেলে,
মধু বিধুরা এলো হোই হুল্লোড়ে।
নতুন পোশাকে মনে উল্লাসে,
সবাই মাতছে আজ খুশির আমেজে।

অষ্টমীতে সাজের বাহারে,
সাজছে নারী শাড়ির আঁচলে।
পাঞ্জাবী গায়ে ঐ দেখা যায়,
কৈশোরের প্রেম মজবুত হয়।

নবমীতে হঠাৎ যেন,উদাস হয় মন,
তবুও যেন শেষ আনন্দটা এমনি সতেজ হোক।
সন্ধ্যা কালে সবাই মিলে, নাচবো মোরা চল,
আবার কখন এমন সময় আসবে কবে বল।

দশমীতে মা'র মুখ খানি দেখো,
রোদনের জলে সিক্ত বুঝি...!
উমা চলে যাবে তাই বুঝি কি,
সিঁদুরের খেলাতেও আজ বিদায়ের সুর...!

মা তুমি সর্বদা এমনি থেকো...
রেখো আমাদের প্রকৃত মানুষ করে।
আসছে বছর আবার এসো মা,
নতুনের সাজে নতুন রূপে।
সব কালিমা কে দূরে সরিয়ে,
এক ভালোবাসার নতুন পৃথিবী গড়তে।

প্রবাসী প্রজন্মের প্রতি

সুছন্দ চ্যাটার্জী

আমাদের পূজো, ৪-৫টা হতো নতুন জামা।
আমাদের পূজো, কালী পটকা , চকলেট আর দোদোমা।
আমাদের পূজো, কাঁধে ঘট আর কলাবউএর দোলা।
আমাদের পূজো, সপ্তমীতে সকাল থেকেই খেলা।
আমাদের পূজো, অষ্টমীতে অঞ্জলীর উপোষী।
আমাদের পূজো, নবমীতে দুপুরবেলায় খাসি।
আমাদের পূজো, দশমীতে ঘট বিসর্জনেই বেলা।
আমাদের পূজো, পাড়ার সুন্দরীদের সিঁদুর খেলা।
আমাদের পূজো, প্রতিমা বিসর্জন, নাচ আর মিষ্টি।
আমাদের পূজো, শেষ বেলাতে খিচুড়ির ফিষ্টি।

আমাদের পূজো তোরা কি আর বুঝবি কচির দল।
তোদের পূজো প্রবাসী বং এর। Around autumn fall.
তোদের পূজো এক-দু দিনেই সাঙ্গ end to end.
তোদের পূজো indoor hoi. Over the weekend.
তোদের পূজো নিয়ে খুব বেশি কি আর বলা যাই?
গান, বাজনা, খান, পান, ছোটো করে সবই হয়।

তবে,
দুই পূজোতেই উদ্দীপনার অভাব নেইকো রত্তি।
আগমনীর পরম্পরার বাহক দুটোই। সত্যি !!
আমাদের পূজো তোদের পূজো, দুটোতে ঢের ফারাক।
আমাদের পূজো তোদের পূজো, দুটোই বেঁচে থাক।
স্বদেশ বিদেশ আগমনিতে মায়ের আবাহন।
প্রবাসের প্রতি প্রজন্মের প্রতি অভিনন্দন।

ज़िंदाबाद ज़िन्दगी

ख़ुशी वर्मा

हंसना हसाना ज़िन्दगी है, हँसते हुए दुनिआ से जाना ज़िन्दगी है,
हम पे हसने वाले, हमसे हंसने वाले, और हमारे साथ हसने वाले बहुत है,
इन हंसने जलने वालो के बीच, अपनी मंज़िल की राह बनाना ज़िन्दगी है,
हंसना हसाना ज़िन्दगी है, हँसते हुए दुनिआ से जाना ज़िन्दगी है !

पैसा तो आता जाता है, फ़र्ज़ निभाने के लिए पैसे कामना ज़िन्दगी है,
पैसा को आना जाना है, मगर कम पैसे में खुश रहना आना ज़िन्दगी है,
मुश्किल वक़्त में हार जाना आसान है, मुश्किल वक़्त को मुस्कुराते हुए हराना ज़िन्दगी है,
हंसना हसाना ज़िन्दगी है, हँसते हुए दुनिआ से जाना ज़िन्दगी है!

अपने लिए जिए तो क्या जिए , अपनों के लिए जीना आना ज़िन्दगी है,
जीवन से हताश लोगों में, जीने का उल्लास जगाना ज़िन्दगी है,
जीवन के बाद भी लोगो के दिलों में ज़िंदा रहना ज़िन्दगी है,
हंसना हसाना ज़िन्दगी है, हँसते हुए दुनिआ से जाना ज़िन्दगी है !

ना कुछ लेके आये, ना कुछ साथ जाना , ये जान कर भी फक्र से जीना ज़िन्दगी है,
दिल की मजबूती, आत्म- विश्वास के साथ बढ़ते जाना ज़िन्दगी है,
खुद के फैसलों पर अटूट भरोसा करते जाना ज़िन्दगी है,
हंसना हसाना ज़िन्दगी है, हँसते हुए दुनिआ से जाना ज़िन्दगी है !

Crossword for Juniors

Subrata Kumar Dutta

(Brackets indicate number of letters)

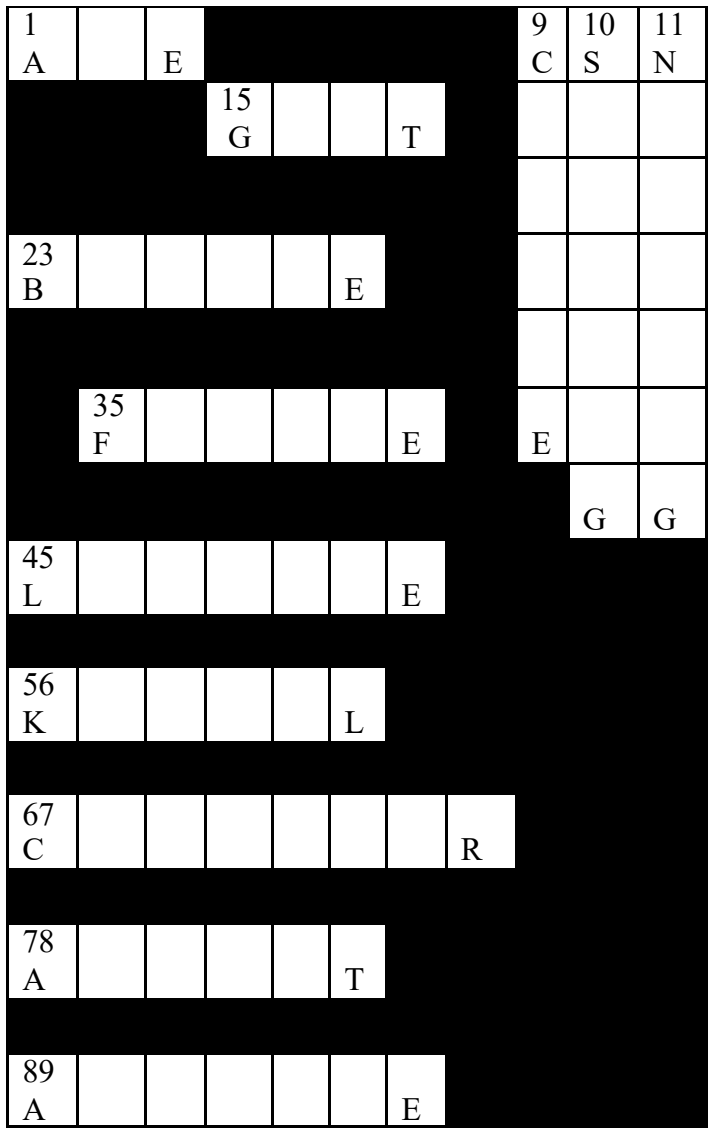

Across:

1. Larger than monkey but no tail (3)
15. Noun form of ‘go’(4)
23. Relating to cattle(6)
35. Relating to cat(6)
45. Relating to lion(7)
56. Dog’s house(6)
67. Relating to circle(8)
78. One who is skilled in drawing(6)
89. One who is skilled in singing/dancing/ music/drama(7)

Down:

9. Relating to dog(6)
10. Brother or sister(7)
11. Nephew or niece(7)

Crossword for Seniors

Subrata Kumar Dutta

(Brackets indicate number of letters)

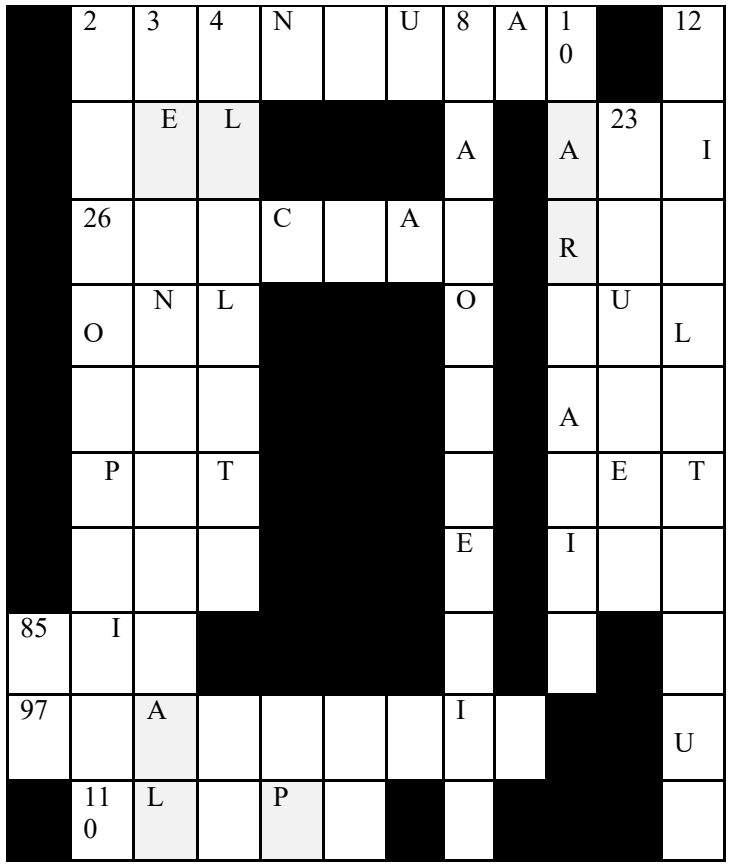

Across:

2. Helpful like an expected behavior of an uncle(9)
26. Of great importance(7)
85. Conquer(3)
97. Loss of ability to perform simple mathematical calculations(9)
110. To leave home secretly to get married without permission of parents(5)

Down:

2. Assistant in any crime(10)
3. Relating to spring (6)
4. To cry loudly esp. in grief(7)
8. Use of vulgar language to relieve stress or pain(10)
10. Very rare(8)
12. Love letter(10)
23. Ability to make good judgements and quick decisions(6)

Ethereal Eastern Experience – Japan East

Sugam Ghosh

The moment someone steps into the mecca of cleanliness, punctuality & politeness would immediately turn into a wonderer. This will so naturally be imbibed into yourself that you end up accepting it as a ritual. “Welcome to Japan”, where travelling probably be more celebrated ritual than heterogeneous religious practices. Trustworthily, Japan will not fail to mesmerize you at every corner of her earth, be it a city center, a small township or an extravagant natural wanderlust- all are there for you to seek.

History of JR East Railways:

Undoubtedly my predominant motivator for this article is Japan East Railway Company's 150th Anniversary celebration. To touch upon brief history, way back in 1872 Japan introduced their first railroad. Within no time, it got expanded into 17 private railway companies. However, all these companies got integrated into JNR (Japan National Railways) in 1906. JNR successfully launched Shinkansen (bullet train) in 1967, after they became public sector company. Finally in 2002, JNR became a private sector company after selling their remaining JR East shares & emerged as East Japan Railway Company (JR East).

East Japan Railway Company (JR East) is the largest passenger railway company in the world. Approximately 16 million passengers travel on its 4,665-mile network each day. The company operates a five-route shinkansen, or bullet train, that travels between Tokyo and the eastern mainland of Japan.

“The Deep North” Introduction:

Enough with JR East railways’ general knowledge, focus now on coverage & value at offer. Japan East majorly divided into two regions – Chubu & Tohoku. However, if natural enchanter you are, Tohoku has a lot to offer.

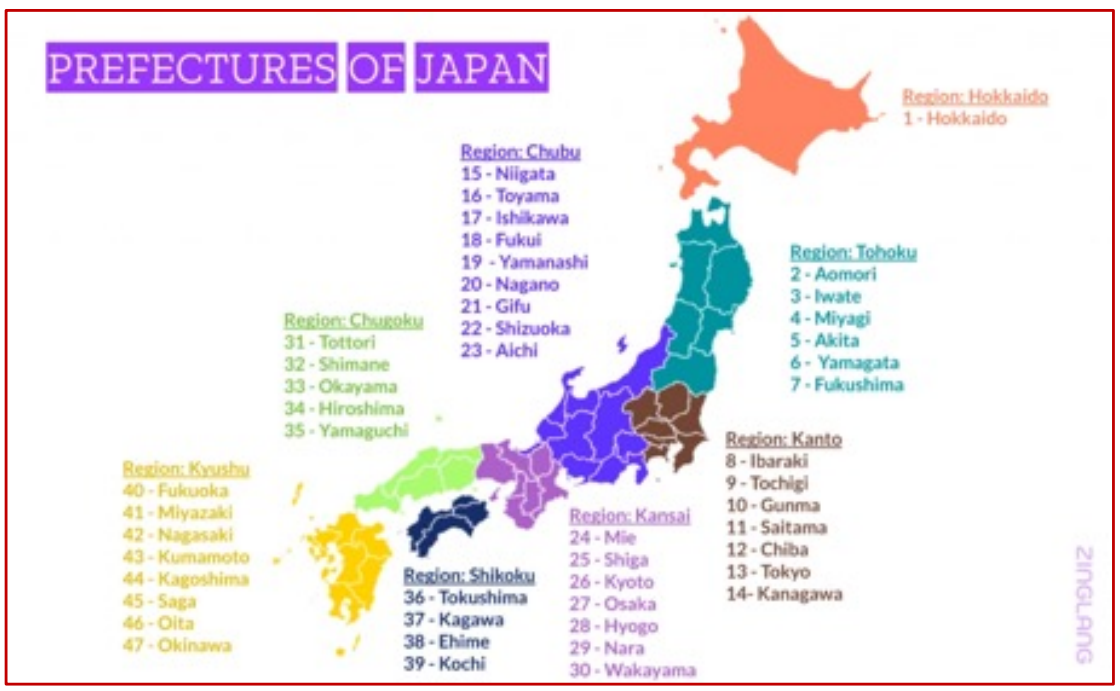

Japan’s northeastern region was once considered as “far off”, called the Deep North. The famous haiku poet Matsuo Basho wrote about Tohoku trip in his masterpiece *Oku no Hosomichi* (The Narrow Road to a

Far Province) in the late 17th century, "*Tohoku was the edge of the Earth; if you were there you were nowhere*". Today the region's six prefectures – Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata and Fukushima – are no longer so unknown or inaccessible. They all are strong competitor to each other on how versatile natural topology they have in offer. Traveling through Tohoku ("*Northeast*"), one come across enormous rice fields, artisanal workshops, fishing hamlets, mountain villages, ski resorts, meadows to hiking paths, paved walkways meander past sea-battered cliffs, Buddhist temples, sacred waterfalls, sea urchin, oyster farms, hot spring towns and what not. Therefore, famous Japanese poets, writers blessed these beauties through their linguistic contributions.

The "**Michinoku Coastal Trail**" as per the poet Basho, "*far recesses of the road*" spans between Hachinohe, in Aomori prefecture and Soma, in Fukushima prefecture.

"雲の峰　いくつ崩れて　月の山" (*Kumo no mine/ Ikutsu kuzurete/ Tsuki no yama*) meaning "the crests of the cloud/crumble frequently/the moon mountain". The moon mountain is nothing but **Mount Gassan** in Yamagata prefecture. The **Dewa Sanzan** in Yamagata Prefecture worshipped as holy mountains since ancient times. The wooden **Five-storied Pagoda of Mount Haguro**, built about 650 years ago among these mountains, presides among old cedar trees and offers peace to those who visit with its simple beauty in harmony with nature.

The city of **Morioka**, with a serene natural sketch of overlooking Iwate Mountain at its vicinity always hailed by Kenji Miyazawa in his famous "*Ame ni mo makezu*" notebook.

Not to mention the historic castles like Hirayama style **Hirosaki castle** in Aomori which has an Edo period *tenshu* and most of its outline remains intact. Noted historian and author Shiba Ryōtarō praised it as one of the "*Seven Famous Castles of Japan*" in his travel essay series *Kaidō wo Yuku*. There is an yearly Snow Lantern Festival around February each year which attracts a lot of tourists towards the castle & Aomori area.

The famous samurai town of Fukushima, **Aizu Wakamatsu** with its enchanting Tsuruga castle. The city is wrapped in history - infamous Boshin war tales, Byakkotai Memorial Hall in commemoration of young samurais' suicide rituals during the war or even Enzoji temple depicting tale of *akabeko,* the symbol of Fukushima Prefecture.

A red cow said to have appeared out of nowhere to assist with building of the temple when all hopes were lost. The temple sat majestically on top of a cliff edge for over 1300 years.

The **Yamadera temple**, a sprawling ancient Buddhist temple built onto a steep mountainside between Yamagata city and Sendai. The beauty of the building ensemble itself as well as the spectacular views offered from the structures - high up on the mountain. Temple's most famous, the *Godaido*, a viewing platform originally constructed to meditate over the beauty of the surrounding landscape, now became main tourist spot, offering breathtaking views towards the valley below and the mountains beyond.

Let's Rock n Roll:

Tohoku is well connected by Japan's wonder transportation "Shinkansen". Additionally, express, local trains as well as bus services operated in this area. There are other private operators providing essential commutation & you have flights operating daily from all major mainland airports. Though, main focus is on trains & local buses from Tokyo in this article.

From Tokyo station's shinkansen platform - 20-23 Tohoku, Yamagata, Akita, Joetsu and Hokuriku shinkansen departs. The station building itself a UNESCO World Heritage site & by any means a big railway station where getting oneself lost is easy. When commuting to eastern Japan via Tokyo -

- For Tohoku, Joetsu, Nagano, Akita, Yamagata Shinkansen (to Sendai, Shin-Aomori, Niigata, Nagano, Akita, Yamagata), station's Nihonbashi Exit is ideal. Yaesu South/Central/North better to be avoided for JR East.
- Tohoku or other JR East Shinkansen are marked in Green.
- Transfer from other JR lines or Tokyo metro lines is time consuming, so always keep 45 minutes buffer.

Ticket counter operated until 22:30 JST near Yaesu North & Yaesu South for last-minute changes.

By Tohoku shinkansen travel until Shin-Aomori traversing through Koriyama,

Fukushima, Ichinoseki and Morioka. These are famous tourist spots so feel free to get down according to your pre-planned itinerary. For Akita, either take Akita Shinkansen or use Tohoku until Morioka for Akita shinkansen transfer.

Hayabusa is the world's fastest one operating in this route clocking nearly 320 km/hr. Komachi, the second fastest one ~320 km/hr also operates under JR East. I personally have experienced both of them clocking 320 km/hr while travelling to Shin Aomori or Akita.

In fact, you may find two shinkansen connected together for certain distances, e.g., often Yamabiko shinkansen and Tsubasa shinkansen gets connected together from Tokyo to Fukushima. Then Tsubasa runs on its own from Fukushima to Shinjo station. Make sure to board the right shinkansen based on travel destination.

All shinkansen has reserved & non-reserved seats. Please take care in identifying the specific unreserved compartments, if no seat reservation is made. At platform, announcements happen before train arrival to inform tourists about unreserved compartments. There are also marks on platform floors to identify the exact coach prior to train arrival.

For questions feel free to ask station attendants, in bright blue colored uniform with blue cap. Keep in mind that shinkansen doesn't have much waiting time at platform especially on busy lines so ensure all sorted before arrival. For first timers would recommend to go through YouTube videos on shinkansen on-boarding & offboarding related, many available for free.

JR Pass to Save your Bucks:

Blessed with such wide network coverage, JR East offers some of the best "value for money" passes for foreign Travellers. There are different categories like "Only for Temporary Tourist visa holders" where you need to submit your passport with 90 days tourist visa stamp or "Foreigners Only" where any non-Japanese passport holder can avail the same.

In fact, most of foreigner category passes requires pass holders' in-person presence with original passport. Only exception to my knowledge would be "Tokyo Wide Pass" where your family/friends/acquaintances can also collect on your behalf.

These passes are available at all major JR tourist information centers of Tokyo, Ueno, Shinagawa etc. or even online. Complete details regarding JR east passes here - https://www.jreast.co.jp/multi/en/pass/eastpass_t.html

Let's focus on "JR East Pass (Tohoku area)" to explore some sample travel itineraries. There isn't much differences in cost between this pass and "JR East Pass (Nagano & Nigata)", however latter has less coverage. Both passes are valid for 5 consecutive days (starting from the journey). Using these passes prebook shinkansen tickets within the coverage area free of charge or can choose to alite unreserved compartments. If you prefer not to reserve tickets in advance, use manned gates for your entry/exit instead of electronic entrances. Few important points -

- Careful with your JR pass as if you lose it, it can't be reissued.
- Take note of the initial pass entry time as valid 5 consecutive days then on. 12 midnight will be your cut off time.
- You can't transfer or hand pass over to someone else. You may find few individuals doing it or even trying to sell passes with unused days however officially it is illegal.
- Keep your passport or Japan residence card with you as a photo identification proof during travel. It is very rare but authorities have the right to ask for details.

Do not board a reserved compartment without a prebooked seat ticket. If circumstances arise find seats with green lights on, which means momentarily they are empty. If light turns yellow, prepare to vacate the seat.

Ess starts East 5 (Free personal experience included):

Every Japanese mountain proffer 4 seasonal ecstasies vividly different from each other hence it is worth visiting them irrespective of seasons. However, winter is very harsh & there are a meter or more high snows at various places in eastern mountains. Often shinkansen service gets altered or cancelled due to heavy to very heavy snowfall. I myself once got my last shinkansen cancelled from Yamagata & ended up merrily stranded in a cozy hotel boozing *Yamazake* (a famous Japanese whiskey). Keeping everything aside, the view from 11th floor window with fluffy snows outside was everlasting. Since I already started talking about *yuki* (snow), let's glide through a 5-day plan to this winter wonderland.

I used to live in *Kawasaki*, a city few hops away from prominent Tokyo 23 yards separated by *Tamagawa River*. for me most convenient Shinkansen location was none other than Tokyo. It's a 20 mins ride from Kawasaki to Tokyo station by *Tokaido* JR line, Japan's longest local line. Back in 2019 winter pre-COVID good old days, trains in this line were packed to its capacity.

Day 1:

I started on a weekday, of course you can start over a weekend owing your own preference & personal schedule. However, to cover 5 consecutive days you may ought to take a couple leave of absence. My first destination was Shin Aomori where intend to cover Hirosaki Snow Lantern festival. Started the day late however can start your day as early as 6 am. Japan "the land of rising sun" always start her day very early. There are plenty of shinkansen options almost in every hour from Tokyo. Honestly, never cared about timetables when travelling in Japan which should give you a rock-solid impression of my confidence about this country & its public transportations.

Shin-Hakodate-Hokuto Hayabusa shinkansen from platform no – 22, reached Shin-Aomori 3 hours later. I travel light unless multiday hiking or overnight camping, so weight of backpack was never been a problem to dash on. Had a booking in Shin Aomori but least bothered with my carry-ons, hence straight-away headed to Nebuta museum via Ou main line. Right across the streets of Aomori station, a red bamboo styled building. Be careful with footwears in February as entire east will be covered with thick white layer. Spent few hours with latest summer nebuta matsuri (festival) floats before hopped into a soya ramen (noodles) restaurant.

In the evening took Ou local line again for **Hirosaki Castle**. For the castle first reach to Hirosaki Station which is about 41 minutes south by local train from Aomori. It is accessible by loop bus available right outside station exit. Take the bus (15 minutes) to the *Shiyakusho-mae* bus stop & then walk about 6-7 mins. I was late for the bus so decided to take a taxi instead for about 1300 yen but reached castle gate in 15 minutes.

It was a sparkling display of glowing lights in white snow & bright red paper lanterns around. It immediately reminded me "*diyas*" we decorate our houses during "*dipabali"* festival in India, "*the festival of lights*". The more I was clicking my camera shutter, the more was I taken back to the moments of my Kolkata house's wi-

-ndows, balconies. It was really an un-forgetful experience which for a brief moment got me time-travelled. And as you can see the first picture there was a tunnel of winter-blooming cherry blossoms lit up in pink, just spectacular!

Plan for **winter day 1**

- Tokyo to Shin Aomori & further to Nebuta Museum in Aomori.
- Evening take Ou line local from Aomori to Hirosaki station. . Walk 30+ minutes from Hirosaki station or catch bus or taxi.
- Head back to hotel in Shin Aomori or again Take Ou line to Aomori for the night.

Plan for **autumn day 1**

- Tokyo to Shin Aomori & further to Hirosaki Station via Ou local line.
- From Hirosaki station catch bus or taxi to the Castel as you need daylight to experience the spectacular fall foliage.
- In the evening head to *Nebuta* museum by taking Ou line & stay in Aomori.

Day 2:

I had to wake up early to grab my breakfast at hotel. Today I head to **Nyuto onsen** in *The Hachiko dog's* Akita prefecture via **Oyasukyo** (Giant Icicles). Now this is quite deep in Akita & I personally not recommend here with small children especially with perambulators or senior family members.

Instead, you can visit **Lake Tazawako** in Akita and if lucky get some glimpse of *Tazawako Yuki Matsuri* (snow festival) which basically constructed on the ski slopes overlooking Lake Tazawa. This is the deepest lake in Japan with clear deep blue water in summer. Keep in mind that dates of Hirosaki snow lantern festival & Lake Tazawa snow festival usually don't coincides however given it will officially start within few days you still be able to look at some unfinished snow statues.

To start the journey, take Tokyo bound *Tohoku-Hokkaido Shinkansen* and do a transfer at Morioka station. Usually, platform 11 of Shin Aomori hosts *Tohoku-Hokkaido hayabusa shinkansen.* At Morioka, walk up to platform 14 to take *Akita Shinkansen Komachi* until Tazawako station. Again, right outside the station you will get bus terminal & just hop into *Nyuto-Kaniba Hot Spring* bound bus. Please note, there are almost all buses go via Tazawako however I picked this up as I was travelling to Nyoto onsen. The bus runs through snow piles both side of the road, watch the kids made *kamakura (small ice igloo for candles)* around their houses. It's all white just like snow white fairytales!

Winter day 2

- Shin Aomori to Morioka & further to Tazawako station.
- Take bus to *Tazawako Lakeside* bus stop. *Komagatake* line, *Tamagawa* line or even *Nyuto* line is available. OR take Lake Circular Line to *Katajiri* bus stop.
- Can travel to **Nyuto onsen or Komagatake onsen** but always take a note of last return bus. Especially from Nyoto or Komagatake onsen.
- Return to Morioka to stay overnight.

Autumn day 2

- Shin Aomori to Morioka & further to Tazawako station by shinkansen.
- Take bus to *Komagatake* line or *Nyuto* line to Kyuyo Center bus stop. Further visit Komagatake onsen area for autumn colors.
- Around afternoon take same line back to *Tazawako Lakeside* bus stop & visit Lake Tazawa.
- Finally return using *Komagatake* line, *Tamagawa* line, *Nyuto* line or Lake Circular Line if you reached *Katajiri* to Tazawako station.

Take bullet back to Morioka and stay overnight.

Day 3:

This was a short day for me particularly because I didn't have any overnight plan. I started my day early & checked hotel out. Grabbed some breakfast from *combini* (convenient stores) & head straight to Miyako station via *Yamada line Sanriku* train. From Miyako station took C04 *Naado* bus to *Oku Jodogahama* bus stop. **Jodogahama beach** is one of the most famous winter beaches in Japan where blue water foams in white snow. Chill here out alone or even with family, feel the fresh cold moist sea breeze and get yourself recharged even in harsh winter conditions. I returned all the way back to Tokyo via Morioka station, but you can also prefer to stay overnight at Sendai.

Generic Winter/Autumn plan for day 3

- Morioka to Miyako station then bus to Oku Jodogahami bus stop.
- Return via same route to Morioka & further take onward journey to Sendai or Tokyo.

If staying at Sendai, check if **Matsushima Bay** can be covered in afternoon. Not recommended for winter.

Day 4:
If you spent night at Sendai, will be more convenient to access Yamagata. I had to take 630 JST bullet to cover my targets. In Yamagata winter, there are many destinations but couple of them are "a must". **Zao monster**, the frozen trees, known in Japanese as *Juhyo*, are also illuminated in a breathtaking lights festival from late December to late February, so definitely stay until nightfall if possible!
The ropeway station, which runs at night during the light-up period, can be reached after a 40-minute ride on the Yamako Bus from JR Yamagata Station. Unfortunately, I had to cover two destinations on the same day so left Zao in the afternoon after a brief skiing. You can ski through the snow monsters, however advised only for learnt skiers.
For return, I took Z90 bus from **Zao Onsen ski resort** bus terminal for Yamagata. After waiting almost an hour, board train to Oishide on Yamagata line local. Trains and buses are infrequent in here so if you plan to cover multiple destinations start very early. Upon arrival at 1710 JST on a windy winter evening & that too with empty stomach, I was shivering as hell! Temperature probably was –8°C, though lot better than Zao onsen ski area –14°C even during day time. At 1745 JST clogged myself into a warm, cozy Ginzan Hot Spring terminal bus & finally reached **Ginzan Onsen** at 1830 JST. Don't ask me how relaxing was it when I slipped myself into a *onsen* (public hot bath) with full stomach.

Travel plan for **winter day 4**

- Tokyo/Sendai to Yamagata & then to Zao Onsen Ski report terminal. Take ropeway to the top. It will be extremely cold so be prepared!
- Return via same route & take Yamagata local to Oishide.

Bus to Ginzan hot spring terminal. Overnight stay in Ginzan Onsen.

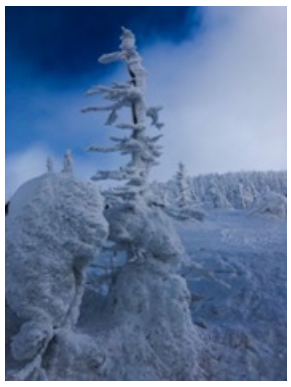

Travel plan for **autumn day 4**

Now here autumn plan will change completely as you don't need to visit Zao.

- Tokyo/Sendai to Yamadera Station via Senzan line to visit autumnal ecstasies of Yamadera temple.
- Head to Yamagata station via same Senzan line, Yamagata shinkansen to Oishide and then bus to Ginzan Onsen.
- Overnight at ryokan for starry Ginzan onsen sky.

Day 5:

Today would be the last day of Tohoku JR pass & be very careful to reach home destination before midnight. Today head to Fukushima, samurai town of **Aizu Wakamatsu,** historical epitome of *Boshin* war. Again, Aizu has different scenic beauties in winter and fall so a common destination irrespective of the season.

From Oishide station take Yamagata shinkansen to Koriyama station & further to Aizu. Next, local bus ride for 10 mins to reach Tsuruga castle or you can venture around the town using the same Aizu buses called "Aizu Loop Bus", looks beautiful for a fun ride. Stayed until 1900 JST to experience castle's snow lanterns before heading back to Tokyo. Finally with a heavy heart, took the Tokaido local from Tokyo around 2330 JST & was reminiscing the journey made through the "Deep North".

Generic Travel plan for day 5

- From Ginzan Onsen take bus to Oishide station, then to Koriyama station.
- Next is Ban-Etsusai line for Aizu Wakamatsu. Once you are in Aizu, you can use "Aizu Loop bus" to hop in & out. The bus terminal is a 3 minutes' walk from the station.

While return, take the same Ban-Etsusai line to Koriyama & *Tohoku-Hokkaido shinkansen Yamabiko* back to Tokyo.

শরতের পল্লী-জাপান

ঋতুপর্ণা চক্রবর্তী

শিরাকাওয়া-গো

ছেলেবেলায় পুজোর সময় আঁকার প্রতিযোগিতা হলেই দেখতাম ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দূরে পাহাড়, ছোট ছোট খড়ের ছাউনি দেওয়া বাড়ি, চাষের জমি, ফুলের বাগান ঘেরা গ্রামের ছবি আঁকতো। শহরে বড় হওয়ায় অনেকটা বয়স পর্যন্ত শরতের গ্রাম্য রূপ দেখার সুযোগ হয়নি, তাই আমি নিজেও কতবার সেরকম স্থান কল্পনা করে রং তুলির ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তুলেছি। দূর্গা পূজার সাথে শরতের এই অপূর্ব গ্রাম্য শোভা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর বছরের এই সময়টা এলেই মন সেরকম কোনো স্থানে হারিয়ে যেতে চায়। কর্মসূত্রে ঘর থেকে অনেক দূরে 'সামুরাইদের দেশ' জাপানে আমার বর্তমান বসতি। এবছর পুজোয় বাড়ি ফেরা হচ্ছে না জেনেই বেশ কিছুদিন আগে থেকেই প্ল্যান করে রেখেছিলাম মহালয়ার দিনে একবার ঘুরে আসবো জাপানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান শিরাকাওয়া-গোর ঐতিহাসিক ওগিমাচি গ্রামটি থেকে।

যদিও এই গ্রামটিতে পর্যটকদের ঢল সারাবছরই কম বেশি থাকে কিন্তু শীতে তুষারাবৃত্ত গ্রাম দেখার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি হয় সাধারণত। কিন্তু আমার মন ভিনদেশের মাটিতে খুঁজছিল এক টুকরো শরতের কাশবন , নীল আকাশ আর সবুজ গ্রামকে। তাই সময় নষ্ট না করেই টোকিও স্টেশন থেকে সিনকানসেন ধরে পৌঁছে গেলাম তোয়ামা শহর। আর সেখান থেকে এক্সপ্রেস বাস ধরে ঘন্টা দুয়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম গিফু এবং তোয়ামা প্রিফেকচার এর সীমান্ত ঘেঁষে চলা শোগাওয়া নদীর উপত্যকায় অবস্থিত একাদশ শতাব্দী থেকে টিকে থাকা গ্রাম শিরাকাওয়া-গো। এরা ঐতিহ্যবাহী গাশো-জুকুরি বাড়িগুলির জন্য সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ, যার মধ্যে কিছু বাড়ির বয়স 250 বছরেরও বেশি।

আমাদের বাসটি শিরাকাওয়া-গো বাস টার্মিনালে থামলো সকাল ১১টায়, এটি গ্রামে ঢোকার ঠিক শুরুতেই রয়েছে। সেখান থেকে সবাই নিজের ইচ্ছে মতন পথ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রামের চারপাশে। আমি গ্রামে না ঢুকে প্রথমে হাঁটা লাগলাম তেনশুকাকু অবসারভেটরির দিকে। সেখান থেকেই দৃষ্টিনন্দন এই গ্রামের সম্পূর্ণ ল্যান্ডস্কেপটি সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। ওখানে পৌঁছে অবাক দৃষ্টিতে দেখলাম আর মনে মনে বললাম

" আরে এই তো সেই ছেলেবেলার কল্পনার গ্রাম!" সেই সবুজ পাহাড়ে ঘেরা খড়ের চালার গ্রাম্য বাড়ি , ধানের খেত ফুলের বাগান সব আছে যা শৈশবের কল্পনায় দেখেছি। মুহূর্তের মধ্যে মনটা আনন্দে ভরে উঠলো। বেশ

কিছুটা সময় সেখানে কাটালাম। কিন্তু সময় সীমিত তাই গ্রামে ফেরার পথ ধরলাম। সদ্য পেকে ওঠার হলুদ ধান ক্ষেত্ , সাদা ফুলের বাজরার ক্ষেত কিংবা পতিত ঘাস জমি ভরে ওঠা রঙিন কসমস ফুলের ঝোপ অতিক্রম করে অবশেষে গ্রামে পৌছালাম। তবে এই ক্ষেত্রে বলে রাখতে চাই হাঁটা পথের পাশাপাশি অবসারভেটরিতে আসার জন্য আছে শাটল বাসরুটও।

শুরুতেই ঐতিহ্যবাহী গাশো-জুকুরি বাড়িগুলির কথা বলেছিলাম যার প্রকৃত অর্থ হলো "প্রার্থনারত হাত নির্মাণ", মানে খড় দিয়ে তৈরি হওয়া এই ছাদ গুলো তির্যক ও ঢালু হওয়ায় প্রার্থনারত দুইটি জোড়বদ্ধ হাতের মত দেখায়। এই ধরনের নকশা আশ্চর্যজনক ভাবে পোক্ত হয়, এবং বাড়িগুলোকে শীতের তীব্র তুষারপাতের ফলে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

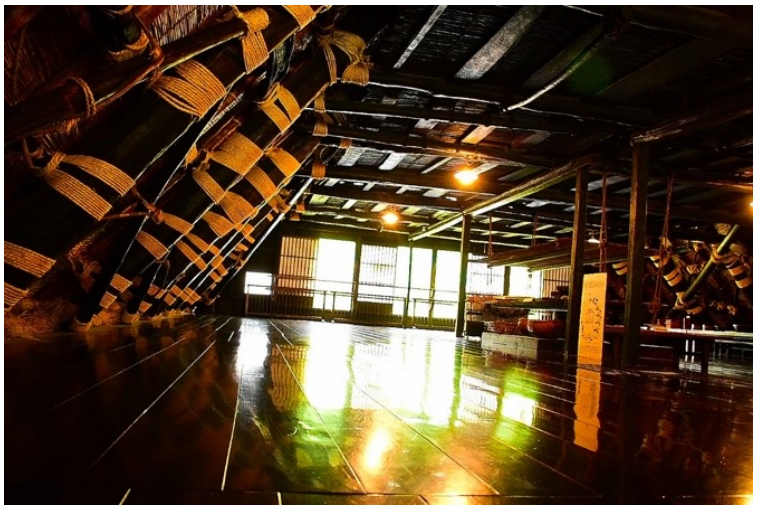

চিলেকোঠার ঘর যেখানে রেশম উৎপাদন হয়

ওয়াদা হাউস

তাছাড়া এই বাড়ির ঘরগুলো বেশ বড় হয়, তিন থেকে চার তল বিশিষ্ট হয় ,সম্পূর্ণ পরিবার বাস করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শিল্পের জন্য প্রচুর ফাঁকা জায়গা থাকে। গাশো শৈলীর ঘরগুলি ঠিক এই কারণেই অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী জাপানি বাড়িগুলির থেকে আলাদা হয়। বাড়ির চিলেকোঠাগুলোতে এডো যুগ থেকে শুরু করে প্রাক শোয়া যুগ পর্যন্ত রেশম উৎপাদনই ছিল মূল শিল্প যা গ্রামের মানুষকে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা প্রদান করতো। এসব কিছু তথ্য আরো বেশি করে জানার জন্য এবং এই বাড়িগুলোর অন্দরমহল দর্শনের জন্য অবশ্যই এখানকার সংরক্ষিত বাড়িগুলো ঘুরে দেখবেন।

আমি যেমন ওয়াদা হাউস ঘুরে দেখেছি যা কিনা এডো যুগের শেষের দিকে নির্মিত (1603-1867),এবং এই বাড়িটি ওয়াদা পরিবারের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদাকে প্রতিফলিত করে।

এখান থেকে বের হতেই চোখে পড়লো গ্রামের আনাচে কানাচে ফুটে থাকা কাশফুলগুলোর দিকে। অশ্বিনের শারদপ্রাতে অজানা দেশের অচেনা গ্রামে একা ঘুরে বেড়াতে গিয়ে অনুভূত হলো এক বৃহৎ সত্য, মাতৃ আগমন দেশ কাল ভেদে সভ্যতার পর সভ্যতা এই একই সৌন্দর্যের সাথে ঘটবে কিন্তু আমরা ক্ষণস্থায়ী তাই প্রতি মুহূর্ত তার উপস্থিতিকে উপলব্ধ করে প্রকৃতির প্রতি আরো যত্নশীল হওয়া আর ভবিষ্যত প্রজন্মও যাতে সেই সব কিছু অনুভব করতে পারে সেই শিক্ষা বা চেতনা প্রদান করা। আরো বেশ কিছু সময় গ্রামের এপ্রান্ত সেপ্রান্ত ঘুরে ক্লান্ত হয়ে খেতে ঢুকলাম এখানকারই এক রেস্তোরাঁয় যেখানে পাহাড়ি শাক সবজি মাছ দিয়ে বানানো চমৎকার সব ঐতিহ্যবাহি পদ পাওয়া যায় । বেলাশেষে মন ও উদরের প্রশান্তি ঘটিয়ে ঘরমুখী বাস ধরে ফিরে চললাম শহরের দিকে সেই সাথে ক্যামেরাবন্দি করে নিলাম অনেক স্মৃতি।

Manami Das
Grade 6

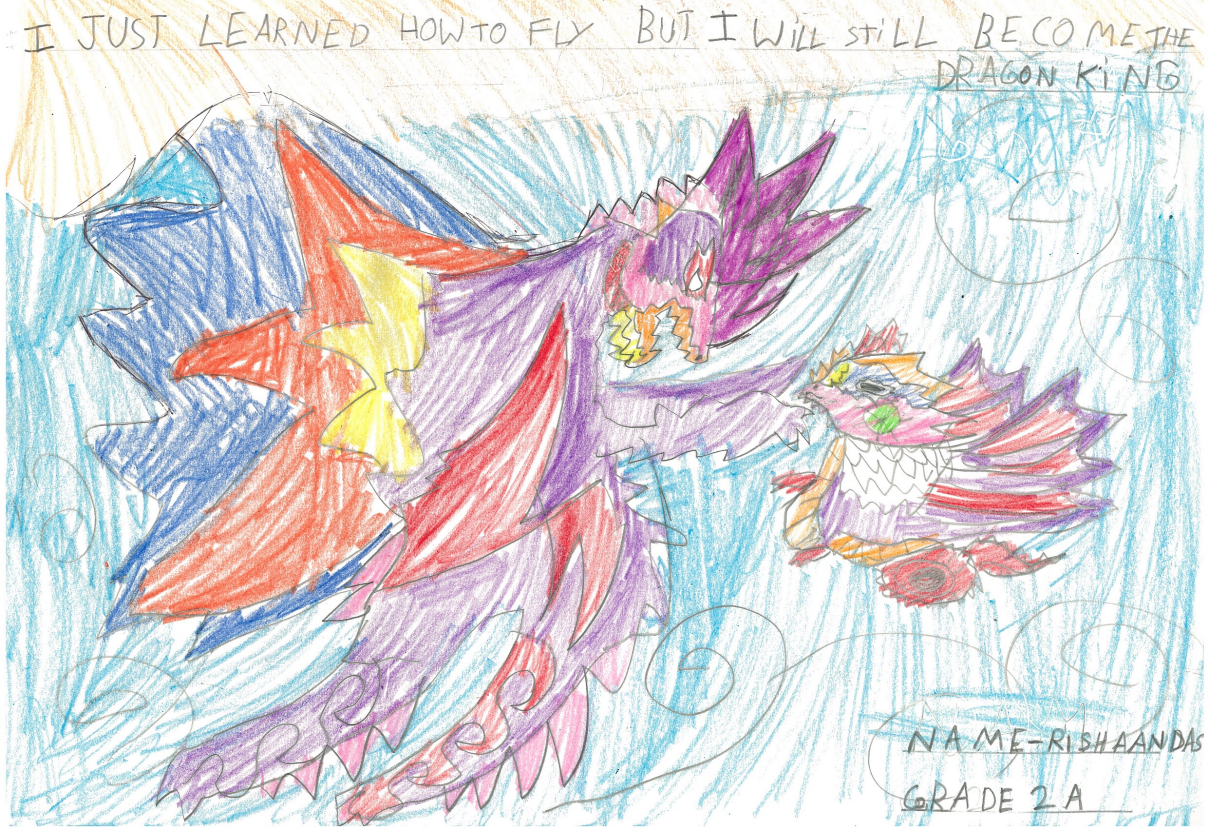

Rishaan Das
Grade 2

Samaira Solanki ,
5 years

Elsa (Frozen)

Audity Bosu

Sourik Bosu

Aumisha Bosu

Antara Ghosh

Ananya Kothari

Shambhavi Solanki,
9 years

Suman Mandal, 21 years

Shreyas Das,
13 years

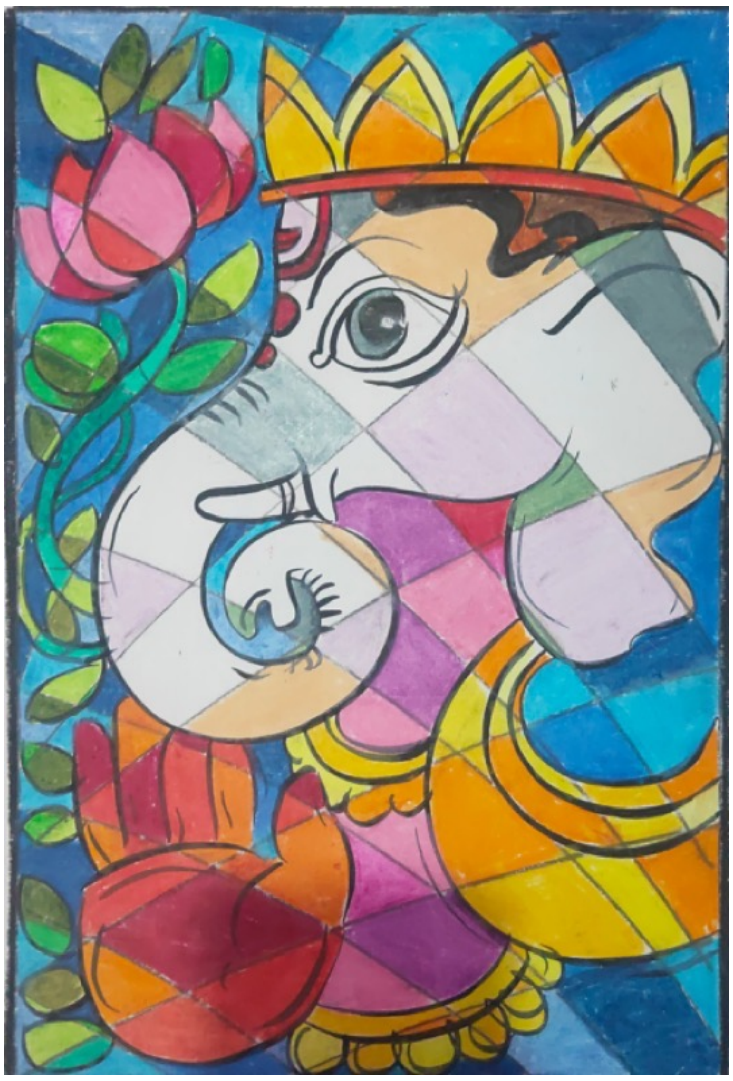

Srija Das,
13 years

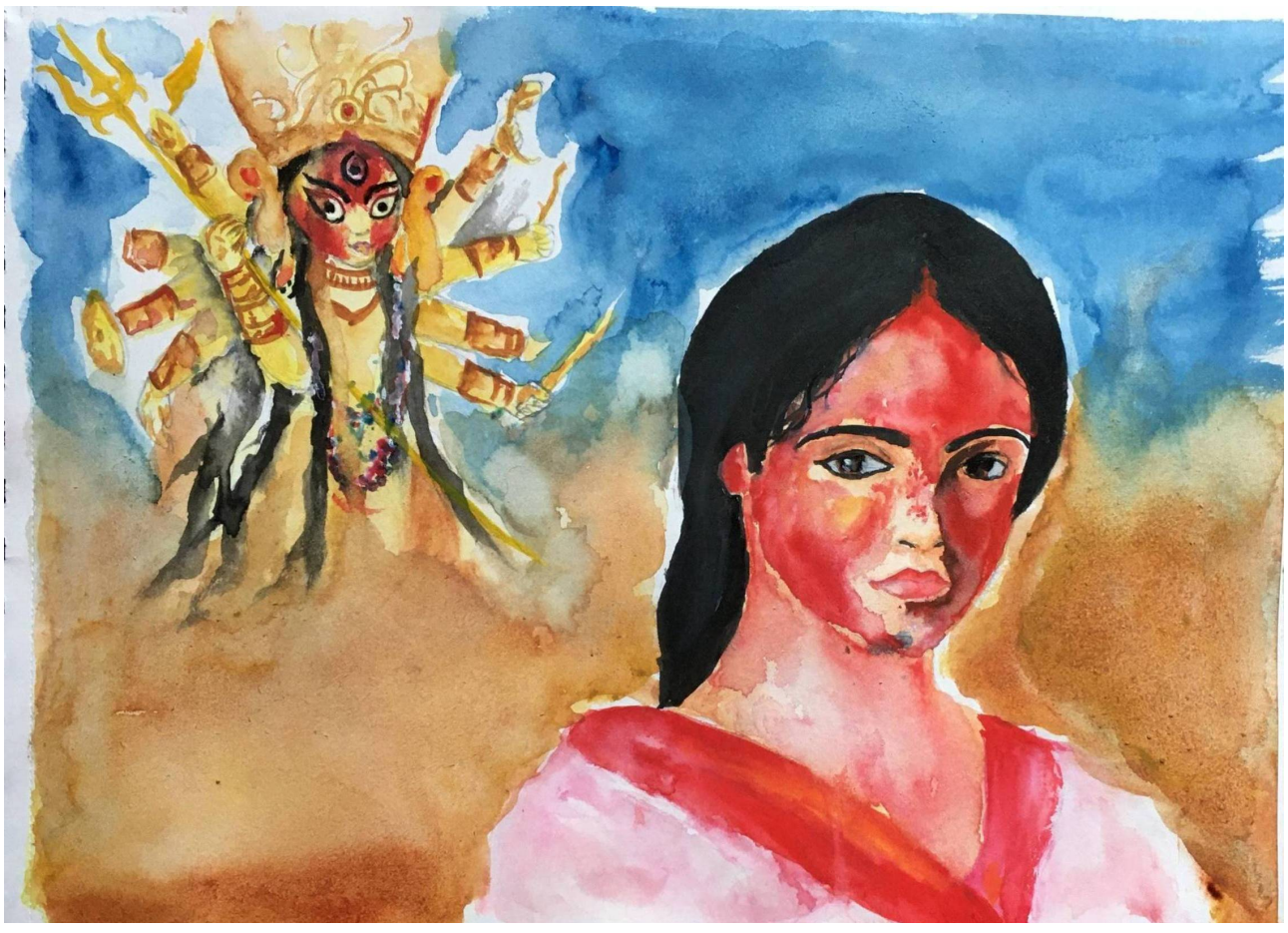

Anuvab Saha
16 years

অ্যাকর্ডিয়ন

অর্চিস্মিতা

দিনপনেরো ধরে রোজই ভাবছি অ্যানের গল্পটা লিখবো! ল্যাপটপের দেওয়ালে ল্যাভেন্ডার রঙের ছোট্ট মেমোরি-নোটে লিখেও রেখেছি সে কথা। রোজ ইউনিভার্সিটির পর যখন ক্লান্তপায়ে হাতবোঝাই মশলাপাতি, ফল আর আনাজ কিনে ফিরি, তখন অ্যানেকে ভুলে যাই। বারোটা নাগাদ যখন উল্মের বিখ্যাত মুন্সটার গির্জার ঘন্টাগুলো পরপর বেজে ওঠে আর শুকনো পাতার সরসরানি ঢুকে পড়তে চায় আমার উষ্ণ ঘরের জানলার শার্সি সরিয়ে, ঠিক তখনি অ্যানের কথা না লিখে ওঠার অপরাধবোধ নতুন করে জন্ম নিতে থাকে ভিতরমহলে।

মাঝেমধ্যেই মনে হয় 'গল্প' বানিয়ে লিখে ফেলা তুলনায় সহজ। তাতে আবেগ থাকে, দায়িত্ব থাকে কম। অনুভব থাকে, তাগিদ থাকে কম। স্বপ্ন থাকে, দায় থাকে না। রক্ত- মাংস- মজ্জা- মনন- চেতনা- স্বপ্ন নিয়ে তৈরি কোন মানুষের জীবনের খণ্ডাংশমাত্র জেনে উপস্থাপনের ভাবনাটিও সহজ নয়। সহজ হ'ত, যদি অ্যানে স্বনামধন্য হ'ত- উইকিপিডিয়া বা নিদেনপক্ষে পেজ থ্রী! সমস্যা হোল ও সাধারণ। অসাধারণরকম সাধারণ।

দিনপনেরো আগের সেই ইলশেগুঁড়ি বরফ-সকাল। শান্ত শহরটির বুক চিরে বারবার পথ করে নিচ্ছিল হিমেল হাওয়ার অশান্ত স্রোত। হেমন্তের কোল আঁকড়ে পড়ে থাকা হলদে মেপল পাতারা বিবর্ণ হয়ে অবাধ্য ঝরে পড়ছিল আমার জ্যাকেট ছুঁয়ে রাস্তায় বরফকণাদের মৃত্যু-আলিঙ্গনে। ভিসার মেয়াদসীমা বাড়ানোর আবেদনপত্রটি জমা দিয়ে গির্জা-চত্বরের কোণাকুণি রাস্তা ধরে দ্রুতপায়ে এগোচ্ছিলাম স্টেশনের দিকে- সেখান থেকে বাস ধরলে আমার ইউনিভার্সিটি।

হঠাৎই মনে হোল পা আর এগুতে চাইছেনা। সামনের বিবর্ণ মেপল পাতাদের ধমনী বেয়ে ফিরে আসছে রঙ- রস- রক্ত! হিমশহরে ধ্বনিত হচ্ছে এক উষ্ণ প্রস্রবণের প্রাণস্পন্দন। কয়েক মিটার দূরত্বের মধ্যেই কোথাও এক অপার্থিব মূর্ছনায় বাজছে অ্যাকর্ডিয়ন।

"আমার শ্রবণ একক স্বরে স্থিতি পায়!"

ধীরপায়ে এগোলাম শব্দঝোরার উৎস সন্ধানে। প্রৌঢ়া শিল্পীর কপালের গাঢ় সোনালি চুলে নভেম্বর- সূর্যের নরম আলো। সবুজ গাউনের উপর বেগুনী লংকোটে অতিব্যবহারের স্পষ্ট জীর্ণতা। সামনে রাখা লাল বাক্সটার দিকে তখনো চোখ পড়েনি। যখন পড়ল, ভাবলুম ইনি কে? ভিখারীর ছদ্মবেশে রানী?

কাঁধে ভারী ব্যাগের অনেকটা ভিতরের দিকে আমার ছোট্ট লাল পার্স- অন্যসময় হোলে এড়িয়ে যেতুম না একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারিনা। কিন্তু সুরসাধিকার সম্মোহনী সঙ্গীত আর লাবণ্যময়ী ব্যাক্তিত্বের যুগ্ম আবেদনে দাঁড়িয়েই রইলুম আরও কিছুক্ষণ- যতক্ষণ না অ্যাকর্ডিয়নের বেলো বন্ধ হোল, শীতের কাঠিন্যে যতক্ষণ প্রলেপ দিলো অকালবসন্তের মধুগীতি। বাজনা থামলে সামনে গেলুম- ভাঙ্গা জার্মানে মুগ্ধতা প্রকাশের রীতি তেমন জানা নেই, তাই সম্মানদক্ষিণার ইউরোটি বাক্সে ফেলতে আলতো ঝুঁকলাম- আর আরও একবার আমার ভারতীয়ত্বের প্রমাণ দিলো আমার পাসপোর্ট নয়, কপালের মাঝে ছোট্ট কালো টিপ! সম্রাজ্ঞী মৃদু হেসে হাতটা ধরে নিয়ে স্পষ্ট ইংরাজিতে বললেন, "আর য়্যু কামিং ফ্রম ইন্ডিয়া, মাই চাইল্ড?"

অ্যানের তখন একুশ। আশির দশকের শেষভাগ। মুন্সটারে অর্গ্যান-কয়্যারে অ্যানেই তখন প্রধান শিল্পী। শৈশবে মাতৃহারা মেয়েটির জীবনে তখন সঙ্গীত আর অসুস্থ বাবাই অবলম্বন। বাবার ছোট্ট বেকারিতে বসতে হয় বিকেলে। পড়াশুনো কোনদিনও তেমন

টানেনি তাকে। অভাবের সংসারে বাবা-মেয়ের বন্ধনের সেতুটিও সঙ্গীত। বাবার পিয়ানোই ছিল অ্যানের বন্ধু, দামী পুতুল কখনো চায়নি সে। পরে অবশ্য মায়ের চিকিৎসার খরচ যোগাতে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়। অ্যানের স্বপ্ন ছিল মায়ের নামে একটা ক্যাফে খোলার- প্রতিদিনের পরিশ্রম, সবটুকু সঞ্চয় আর অনেকখানি ভালোবাসা দিয়ে। ঠিক এইসময়েই অ্যানের জীবনে পরপর ঘটে যায় কিছু ঘটনা।

ভারতবর্ষ থেকে ডাক্তারি পড়তে আসা এক সঙ্গীতানুরাগী ছাত্রের সঙ্গে কোন এক রবিবারের কনসার্ট শেষেই আলাপ হয় তার। ক্রমে বন্ধুত্ব, পারস্পরিক মুগ্ধতা, প্রেম। ছাত্রটির তখন থাকার জায়গা নিয়ে নানান সমস্যা- তার বৃত্তিতে ভালো কোন এপার্টমেন্টের খরচ চালানো প্রায় অসম্ভব! নরম মনের অ্যানে ধরে পড়লেন বাবাকে- একটি ঘরে পেয়িং গেস্ট রাখা যাবে কী না! মেয়ের মন বুঝেছিলেন বাবা। এর একমাসের মধ্যেই এক নভেম্বরের বিকেলে ওয়েডিং গাউন কেনা হয় অ্যানের।

অ্যানেকে বিয়ে করার সুবাদে জার্মান নাগরিকত্ব পেয়ে যায় অরবিন্দ দ্বিবেদী। তবে হিন্দু ছেলেকে বিয়ের 'অপরাধে' অ্যানের অর্গ্যান বাজানোর চাকরিটি আর থাকে না। মেয়ের জীবনে কিছুটা স্থিতি ও সুখের সম্ভাবনা দেখারই হয়তো অপেক্ষা ছিল মিঃ হাইল্যান্ডের। মৃত্যুশয্যায় মেয়েকে দিয়ে এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করান তিনি- শত অভাবেও কাউকে সঙ্গীতশিক্ষা দিয়ে অর্থোপার্জন চলবে না!

বাবা চলে যাওয়ার কিছু সময় পর থেকেই কাছের মানুষটির পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকেন অ্যানে। ইন্টার্নশিপের কাজে প্রায়শই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরা হয়না অরবিন্দের। শনিবারের সান্ধ্য পার্টীতে বাড়তে থাকে সুন্দরী শিক্ষিতা সহপাঠিনীদের ভিড়। অ্যানের সহনশীলতার বাঁধ ভাঙ্গে এক রাতে। চূড়ান্ত তিক্ত অশান্তির পর রাগে- অপমানে ঘরের দরজা বন্ধ করে চোখের জল ফেলেন সারারাত। সকালে আবিষ্কার করেন, ব্যাঙ্কের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে স্বামীরত্নটি ফেরার। দিদিমার থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বাড়ি আর কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র ছাড়া নিঃস্ব হয়ে যান অ্যানে!

অর্থ- সম্মান- খ্যাতি- প্রেম ... প্রাপ্তির ঘরে শূণ্য! তবু নিজেকে সামলে ওঠার পর থেকেই প্রিয় মুন্সটারের কাছে এসে প্রতি দুপুরে নৈবেদ্য অর্পণ করে চলেছেন অ্যানে। কখনো পথচলতি কোন নাগরিক মুগ্ধ হয়ে সামান্য কিছু দিলে সেই টাকা সংসারে খরচ করেননা পারতপক্ষে। বাড়িতেই একটি ঘরে শিশুদের অ্যাকর্ডিয়ন শেখানোর ক্লাস নেন- অবৈতনিক! আর তাদের জন্যই প্রায়- অচল বেকারিতে নিজের হাতে তৈরি করেন জিঞ্জারব্রেড, নানারকমের সুস্বাদু কুকিজ!

ভারতীয়দের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা অ্যানের। ভারতের শিল্পবোধের প্রতিও। আমি ভারতবর্ষের মেয়ে শুনে ইউরোটুকুও নিতে চাইছিলেন না। ওনাকে আর কী করে বোঝাই যে সেথায় এখন হানি সিং-এর গান একঘন্টা সামনে থেকে শোনার জন্য বা আইফা অ্যাওয়ার্ড-এর ভাঁড়ামি দেখার জন্য লক্ষাধিক টাকা খরচ করে বেশ অনেকে। আর অন্যদিকে সিউডো- আঁতেল শ্রেনী...থাক!

কত অসহিষ্ণু আমরা! জীবনে একের পর এক বঞ্চনা, অভিঘাতের পরেও অ্যানের মানসিকতায় কোন তিক্ততা চোখে পড়লো না। অরবিন্দের কথা বলার সময়েও কোন ঘৃণা বা রাগের অভিব্যক্তি দেখিনি... কেমন যেন এক নিরাসক্ত করুণা! ক্ষমার শান্ত স্রোত ফল্গুধারায় বয়ে চলেছে চেতনায়, ধমনীপ্রবাহে- আর হয়তো সেজন্যেই অ্যানের সঙ্গীত এত অমলিন, অনায়াস, অপ্রতিম। ক্ষমা করতে পেরে ভীষণভাবে জিতে গেছেন অ্যানে- জগতের চিরায়ত আনন্দযজ্ঞে!

আমাদের জীবনটাও হয়তো এক বাজতে চাওয়া অ্যাকর্ডিয়ন।

কখনো সুরতরঙ্গে বাতাসে পলাশ-কাঁপন, কখনো অনবধানে নিঃস্পৃহ ছন্দপতন- দায়ভার একান্ত আমাদের। জীবনকে শিল্পের মতো সৃজন করার সুচারু দক্ষতার সেই অসমসাহসিক পরীক্ষায় স্কুলছুট অ্যানে সসম্মানে উত্তীর্ণা!

'ক্ষমা' প্রসঙ্গে আরেক প্রিয় মানুষ নবনীতা দেবসেনের একটি কবিতার পঙক্তি মনে আসছিল-

"তুমি মেরেছিলে বলে আজ আমার ফলন্ত বাগান!"

প্রতিশোধ-প্রতিহিংসা-প্রমাণ করে দেওয়ার দৌড়ের হুইসল বেজে গেছে আর আমরা অনভ্যাসে ভুলেই যাচ্ছি ক্ষমা করে দিলে ঠিক কতখানি শান্তিতে থাকা যায়! অ্যানেকে চেনার পরেও আমরা তুচ্ছ কারণে মান-অভিমান করবো, আদর্শগত অনৈক্য থাকলে ব্যাক্তিগত আক্রমণ শানাবো, তীব্র যন্ত্রণা পেলে আহত বাঘের মতো শাস্তি ফিরিয়ে দেওয়ার ছক কষবো আর নিজেদের সৃষ্টি করা বিষে নিজেরাই ধ্বংস হবো প্রতিদিন... গাঢ় অ্যাসিড ধরে রাখা পাত্রটি যেভাবে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়!

ততক্ষণে দক্ষিণ জার্মানির এই ছোট্ট শহরে নতুন সূর্য উঁকি দেবে ইতস্তত...অ্যাকর্ডিয়নের রীডে নতুন কোন অনুপম সুরের লহর তুলবে এক ক্ষমাসুন্দর জাদুকরী!

বিলুপ্ত পাখিদের কলারটিউন

সৈকত ঘোষ

প্রত্যেকটা শহরের একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে। চেনা আলো-বাতাস শরীরে ভরে দেয় অচেনা নিশ্বাস। আমি সেই চেনা ঘাম গন্ধে নিজেকে খুঁজে চলি। এ এক অদ্ভুত নেশা, একটা আবিষ্কার। হাঁটতে হাঁটতে প্রবেশ করি তোমার বৃত্তে। এভাবে নিজেকে নির্মাণ করতে বসে আয়না হয়ে যাই। শেষ লোকালে বাড়ি ফেরা একাকিত্ব জানে স্বাধীনতা মানে নিজস্ব জল মাটি আলো বাতাস।

একটা না লেখা স্বপ্ন। ঘন হতে হতে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতো। রূপকথা পাড়ি দেয় লোকাল ট্রেনের জানলায়। সমস্ত আপেল সমীকরণ, ভিড় ঠেলে জেগে ওঠা অপেক্ষা মুখোমুখি। আমরা অজান্তেই আলো কুড়িয়ে নিই, কুড়িয়ে নিই মুঠো ভর্তি যুদ্ধ প্রস্তুতি। এভাবেই তো তোমাকে লিখবো ঠিক করেছিলাম। অনেকক্ষণ একসঙ্গে হেঁটে যাবার পর মুঠো খোলে রোদ। রোদের কোরিওগ্রাফি তোমাকে চোখ দিয়েছে, আশ্চর্য সেই চোখ। আমি জাপটে ধরি রূপকথার শহর। কলারে ঘুম-জ্বর। আমার ডায়েরিতে টুকরো টুকরো তুমি। কী ভয়ঙ্কর সুন্দর, প্রাচীন বর্ণমালার মতো উজ্জ্বল মাছ। আমার কলকাতা একা হেঁটে যায়। হাজার হাজার পায়ের মাঝে কবিতার মতো সে উপস্থিতি। তুমুল বৃষ্টিতে আমি ছাতা ভুলে যাই। ভিজতে ভিজতে গেয়ে উঠি রবীন্দ্রনাথ। জানি না এ অবেলায় তুমি ফুরিয়ে গেলে শহরটাও ফুরিয়ে যাবে কিনা? হোমিওপ্যাথির শিশির মধ্যে রহস্য ভরে নিয়েছে লেন বাইলেন। পুরোনো কলকাতার এপিসেন্টার জুড়ে ক্ষয়ের সতর্কীকরণ...

আমি হুইসেল শুনতে পাই। বন্ধ কারখানার গেটে কারা যেন সেঁটে দিয়েছে গোলাপি পোস্টকার্ড। ঠিকানায় তুমি লেগে আছো। কে যেন কানে কানে বলে যায় কাচের ওপিঠে প্রত্যেক মিনিটে নতুন নতুন পাহাড় জন্ম নিচ্ছে। এ কি মৃত্যু উপত্যকা? নাকি উড়ান চিহ্ন? নতুন আবাসনগুলোয় কেউ কারো সাথে কথা বলে না। স্টেইনলেস গাছ ভুলে গেছে সূর্য দেখতে। ভাবছি কতটা শিকারি হয়ে উঠেছ তুমি। নাকি সবটাই নতুন প্রেম প্রস্তুতি!

অভ্যেস কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে নিজেই নিজের মধ্যে ভরে নেয় বিষ। আমি মানুষের ভিড়ে পাগল খুঁজে বেড়াই, ওরাই তো এই শহরের প্রাচীন ঈশ্বর। বাড়ি বদলে যায়। রাস্তা আটকে দাঁড়ায় উদ্ধত বাইশেপা। আমি নিজেকে খুঁড়ে দেখি, এ রূপ এ অনুলেখা কোথাও কোনও শব্দ নেই। শূন্যের মধ্যে কোটি কোটি শূন্য, কোটি কোটি আঁকড়ে ধরা। এত অন্ধকার, এত ক্ষয় তবুও ভালোবেসে ফেলি। পাগলের মতো। ভালোবাসা একটা অসুখ। বুঝি তুমি ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়ছো, তোমার শরীর থেকে আরও হাজার হাজার শরীরে। এভাবে কোনও কারণ খুঁজে পাই না। চেষ্টাও করি না হয়তো। তোমার অদৃশ্য চোখ আমাকে টানে। আমি গন্ধ মেপে মেপে এগিয়ে যাই। আমাকেও শিকার করতে হবে, স্বপ্ন শিকার করতে হবে।

চেনা পথের বাঁকে

দীপশিখা পাল

যে গতিতে ছন্দ থাকে আপন খুশীর দোলা লাগে তেমনি দু-চার কদম এগিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়, হাসি হাসি মুখে উপরের দিকে তাকিয়ে বলে "খেপি একটা বিস্কুট দিবি"? আধো আলো সেরে মালতীলতার কোল ঘেঁষে আমিও বলে উঠি "আগে তুমি বল আমি কে"? ইচ্ছে হলে স্মৃতি হাতড়ে দু-চারটে নাম বলে নয়তো বড় বড় কাজল কালো চোখে গাল ভর্তি হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিস্কুট কখন নেয় কখনও বা আনার অবসরেই একছুটে অন্যকোথাও চলে যায়। তারপর বেনেপুকুরে মাথা গলা ডুবিয়ে সস্তা ছিটের ফ্রক পড়ে আবার সেই চেনা ছন্দ চেনা গতিতে বাড়ীর পথে রওনা দেয়। জ্ঞানত স্বাভাবিক দশায় আমার তাকে দেখা হয়ে ওঠেনি। পাড়াতুতো সম্পর্কে বাবার পিসীমা হলেও বয়সে মায়েদের ছোটই হবে। অভাবী সংসারের পিতৃহীনা মেয়েটি ভালোবেসেছিল। দুর্ভাগ্যবশত সে প্রেম পরিণতি পায়নি। ভালোবাসার মানুষ সংসারী হলে রাগ, ক্ষোভ, অভিমান নয়, অবসাদ পাগলামির রূপ নেয়। শাঁখা-পলা-সিঁদুর পরে অজস্র কথা আপন মনে বলে যাওয়া দেখে সেদিনের ছোট্ট আমি-রা ভয় পেয়েছিল আবার কখন যেন সবকিছু গা সওয়া হয়ে গেছে। অজস্র কথনের পর দু-চারদিনের নিরুদ্দেশ, এদিক ওদিক সেদিক খুঁজে আবার ফিরিয়ে আনা। তারপর স্তব্ধতা এলোমেলো পথে ছুটে ছুটে স্নান । শীতের রোদুরে ঠাকুমা বড়ি দিলে, হাসিমুখে উঁকিঝুঁকি দেয়। "বুড়ি বোস" বললে এক গাল হেসে ঠাকুমার কোলঘেঁষে বসে বলে 'বড় বৌদি, ভেটুর মা", খুব সামান্য ক্ষণের জন্য হয়ত পূর্ব স্মৃতিতে ফেরে-তারপর নিরুত্তর থেকেই আস্তে আস্তে চলে যায়। সত্যিই কি সব ভুলে গিয়েছিল না কি ভুলে থাকতেই চেয়েছিল? কে জানে। তবে বিজলী তো- তাই অন্ধকার মন মেঘের বুক চিরে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতোই হয়ত আশা জুগিয়ে তার শৈশব, কৈশোরের সব স্মৃতি অন্ধকারেই নিমজ্জিত হত। শুধু ছোট ছোট চুলের ছিটের ফ্রকপরা পাগলী পিসি নয়, আবছা আলোয় আজও দেখি কোমর জড়ানো হাঁটুর নীচে শাড়ি পড়া এক ঢাল কালো চুলের শ্যামাঙ্গী বিজলীকে - পিছন ঘুরে বসে বৌমাদের কাছে চুল বাঁধছে, কোন এক গোপন কথার সূত্রে আরক্ত তার মুখ, উজ্জ্বল হাসির ছটা তার কাজল কালো চোখেও যেন আলতো স্পর্শ দিয়ে যায়।

****

দেওয়ালে টাঙানো মেধা তালিকার ওপর একরাশ কচিকাঁচা মুখের ভীড়। উত্তেজনা তুঙ্গে - একান্ন জন প্রথম বিভাগ, চোদ্দ জন স্টার মার্কস – নাহ্ এমন মারাত্মক ভালো রেজাল্ট আগে কখনো তো হয়নি। দেবপর্ণা ভীড় ঠেলে থমকে দাঁড়ায়, নিজেকে খোঁজে। মধ্য-মেধার রীতিমতো পরিশ্রমী মেয়েটি ইচ্ছে পূরণের কাছকাছি পৌঁছেও সামান্য দু-এক নাম্বারের জন্য স্টার মার্কস না পেয়ে প্রথম বিভাগেই উত্তীর্ণ হয় । তারপর আলাদা আলাদা পথে যে যার মতো করে

এগিয়ে যাওয়া , মাঝেমধ্যে কমন ক্লামে দেখা হয় বটে, ওবে সেই গল্প আর প্রাণীখুলে হাসির অবসর কমই মেলে। দেখতে দেখতে একদিন স্কুলজীবন ও শেষের মুখে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সেসেই চড়ক মেলা। খবর পাই দেবপর্না সংসারী হয়েছে, সম্পূন পারিবারিক সিদ্ধান্তে। আমরা অনেকেই যখন দুচোখে রঙিন ঋপ্ন নিয়ে কলেজের প্রতীক্ষায়, দেবপর্না তখন ইচ্ছে গুলোকে শিকেয় তুলে হাতা-খুন্তির জীবন শুরু করে। একই সাথে শুরু হওয়া পথ চলা কখন যে কার স্তব্ধ হয়ে যায় বা অন্য পথে মোড় নেয়- কেই বা বলতে পারে। তবুও বড্ড ভাবি আমি তাকে, আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা সুপ্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মানুষদের মতো দেবপর্নাও তো ছিল - আরো একটু সুযোগ পাওয়ার যোগ্য কি সে ছিল না? কেমন জানি হারিয়ে গেল-- চাইলেও আমাদের চেনাগন্ডীর মাঝে হয়ত অভিমানে কোনদিনই আর ধরা দেবে না।

****

ও আমার কথা বোঝে? কে জানে - শুধু যেখানেই দেখা হোক দুহাতে কোমড় জড়িয়ে বুকে মাথা রাখে আর অনর্গল হাত মুখ নেড়ে অনেককিছু বলার চেষ্টা করে। মাঝেমাঝে ওরই যমজ বোনের দ্বারস্থ হই, বাকীটা সেই বলে দেয়। বোকা - শ্যামল সুন্দর, নিরুত্তর, ছটফটে কুহু স্বল্পভাষী, কেকাকে আগলে রাখা দায়িত্ববান বোন। নিম্নবিত্ত পরিবারের সবাই জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে গেলে কুহু, কেকা দুজনে একই স্কুলে আসে । বছরখানেক মূকবধির দের স্কুলে গেলেও দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেনি পরিবার। সবাই যখন লেখেপড়ে, আমার আবদারে কেকা তখন একের পর এক অসাধারণ ছবি আঁকে। প্রশংসা করলে কুহুর দিকে তাকিয়ে সবটুকু বুঝে নিয়ে দুহাতে হাসি হাসি মুখ ঢাকে। লকডাউনের দুটো বছর কেকাকে দেখিনি - সুরের তারপর দেখি কাঁধ ছুঁয়ে গেছে আমার, বড় হয়ে গেছে - তবে সেই ছেলেমানুষিগুলো তেমনিই আছে, সেই সারল্য-একমুখ হাসি। একদিন নতুন স্কুলে আসার তাগিদে আমারও বিদায় নেবার সময় হল - ফেরার পথে যতক্ষণ দেখা যায় আর সবার মাঝে আরেকটি মুখও আমার মর্মে গেঁথে থাকে - কেকা, কুহুর হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে। বড্ড মনখারাপ, চিন্তা হয় আমার এই অষ্টমশ্রেণীর ছাত্রীটির প্রতি।

কেউ কি তাকে বুঝবে কোনদিন? নাকি আরো অনেকের মতোই একদিন তারও হাসিমুখে বিষন্নতার ছোঁওয়া লাগবে? আমার চেনা পথের বাঁকে খুব সাধারণ এইসব অসাধারণ মনের মানুষগুলোর জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া মানুষের বড্ড অভাব। তাই তাদের জীবনের গল্পগুলোও মাঝপথে বিবর্ণ হয়ে বড্ড একলা হয়ে যায়। কয়েকটা দৃঢ় মনের, শক্ত হাতের ভীষণ প্রয়োজন ছিল ওদের খুশিগুলোকে সজীব করার জন্য।

চাঁদ

নূপুর মুখার্জি

শঙ্খধ্বনি ও উলু দিয়ে উঠল বোসবাড়ীর দিদা। ভাবলাম আজতো বৃহস্পতিবার নয় বা পূর্নিমাও নয় বা বিশেষ কোন পূজাও নয়, তাহলে কিসের জন্য এই উলুধ্বনি? ঘন্টাখানেক বাদে সব ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে বড় বড় মিষ্টির প্লাষ্টিক ডিব্বা এল। শুনলাম কারনটা। ছেলের ঘরে ছেলে হয়েছে। বিন্দি মানে সবুজের বউএর কিছু কমপ্লিকেশনস্ ছিল বলে বাপের বাড়ীতে টানা ছিল। দেখতে দেখতে দুমাস এর মাথায় বাচ্ছা নিয়ে বিন্দি ফিরল। একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম বাচ্ছাটি হওয়ার দিন যে আনন্দে মেতে ছিল বোসবাড়ি তিনদিনের মাথায় বাড়ি চুপ। বোসদিদাও চুপচাপ, ব্যাপার একটু খটমট লাগছে। ফ্ল্যাট বাড়ির সবার মধ্যে ফিসফাস - বাচ্ছাটা নাকি ঠিক চায়নিজ ডলএর মত। বাড়িতে কেউ মানতে পারছেনা ডাক্তারের কথা শুনে, বলাবলি শুরু হয়ে গেছে, পরিবাবের কারো এরকম হলনা - বিন্দিই অপয়া, বিন্দির বাগানের দোষ। অবহেলার সূচনা। সবুজতো মানলোই না, উল্টে বদলি নিয়ে পাহাড়ে পাড়ি দিল। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম বাচ্ছাটি নাকি সাধারণ অবয়বের নয় , ডাউন্স সিন্ড্রোম। এতে আমার একটু উৎসাহ বেশি, তাই একটু দায়িত্বের সাথে উৎসুক মনে উকিঝুকি মারতে শুরু করলাম বোসদিদাদের ফ্ল্যাটে। বিন্দির সাথে আগে এতটাও ভাব ছিলনা, কিন্তু ধীরে ধীরে সখ্যতা বাড়ল। যাওয়া আসাও বাড়ল। বোসদিদার ততটাও পছন্দ ছিল না আমার বিন্দির সাথে ভাব হওয়াটা। বিন্দিকে বোঝালাম যে নেটএ সার্চ কর, তাহলে একটু এনরিচড হবে ট্রাইজমি ২১ বা মঙ্গলয়েড বা আরেকটু পরিচিত ডাউন্স সিন্ড্রোমের সাথে। কারণ ছেলে একটু অন্যরকম বাচ্ছা সেটাতো বুঝতেই পেরেছো, তাই দ্রুত হস্তক্ষেপ যদি ছোট থেকেই কর তাহলে ওকে সমাজের সাথে পা মিলিয়ে চলাতে পারবে। বিন্দি ওকে চাঁদ বলে ডাকে - যদিও বাড়িতে মুখেভাতে নাম উঠেছে সমারোহ বোস।

এবার একটু বিন্দির কথা বলি। সে পড়াশুনায় ভালো রেজাল্ট করা মেয়ে, ভালো আঁকতে পারে। আর্ট কলেজে পড়তে গিয়ে কখন কিভাবে সবুজের সাথে আলাপ, আর আলাপ গড়িয়ে বিয়ে। ভীষণ রোমান্টিক মেয়ে এই বিন্দি, কিন্তু সবুজ হল মায়ের সুবোধ বালক। কি করে যে প্রেমটা হল তা ভাবলে আজো বিন্দি হাসে মনে মনে। বিন্দি হল খুব চনমনে আর হুল্লোড়বাজ মেয়ে, হয়তো সেই অসমানাতাটাই সবুজকে টেনেছিল বিন্দির দিকে।

এ ভাবে কেটে গেল বেশ কয়েকবছর। আজ বিন্দির খুব উদাস উদাস মন। সবুজকে মিস করছে। তাই বারান্দার এক চিলতে আকাশের ফাক দিয়ে উঁকি মারা ধ্রুবতারার দিকে তাকিয়ে বেশ সাতপাঁচ ভাবছে বিন্দি। সবুজের পাহাড়েও এই ধ্রুবতারা আছে নিশ্চই। একটাই শান্তি যে ওর আর বিন্দির আকাশের ধ্রুবতারা টা একটাই। কি জানি কি করছে সবুজ। এর মধ্যেই ভিডিও কল এর বেল বেজে উঠল - সবুজের, টেলিপ্যাথি নাকি? "চাঁদ কি ঘুমাচ্ছে?" - জিজ্ঞেস করল সবুজ। ক্যামেরা টা আকাশের দিকে রয়েছে বিন্দির। "ধ্রুবতারা দেখছ?" - যোগ করল সবুজ। বিন্দি বলল "না গো। আমি আমাদের ধ্রুবতারা কে দেখছি"। বেশ অনেকক্ষণ কথা হল আজ, শেষে ঠিক হল এবার বিন্দিও যাবে চাঁদকে নিয়ে পাহাড়ে। সবুজ ও মেনে নিতে পেরেছে মনে মনে। যদিও বোসদিদার এখনও অল্প খোঁচা রয়েছে। বিন্দির বরের সাথে কথা বলে এত আনন্দ হয়েছে যে আবেগ চেপে রাখতে না পেরে আমাকে ফোন করে ছাদে ডাকল। ইয়ার্কির ছলে গিয়ে বললাম, - সখি এত জরুরি তলব কেন? কি সুসংবাদ দেবে? ও আমাকে

জড়িয়ে ধরে বলল সবুজের কথা, আমারো বেশ আনন্দ হল শুনে। তারপর বুড়ো আঙুলের নখের কোনা খুঁটতে খুঁটতে বলল - মাকে এখনো মানাতে পারলাম না, এখনো বলেন চারবছরের মাথাতেও বিন্দির দোষেই এমন বংশধর। বোসদিদার ডাক শুনে বিন্দি নেমে গেল নিচে, আমি একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। যেহেতু এই ধরনের বাচ্ছাদের মুখের তুলনায় জিভটা একটু বড় আর ভারী হয়, তাই ওরা জিভটা একটু বের করে রাখতে ভালোবাসে। চাঁদ এর সেই সমস্যা নেই , কথাটা শুধু স্পষ্ট নয়, কিন্তু ভীষণ উচ্ছল মায়ের মতো। এটাই এধরণের বাচ্ছাদের লক্ষণ, রিদম লাভার, ফাস্টফুডের মত ওরা উল্লাস করে থাকতে ভালোবাসে, ভীষণ একগুঁয়েও হয়। ছোট ছোট কান, চুলগুলো রেশম রেশম, গলাটা এমন যে কাঁধ আর মাথার মধ্যে অল্প দূরত্ব , হাতের করও কিন্তু নেই বললেই চলে। চার বছরের অবকাশ বোস কিন্তু পড়াশুনায় সক্ষম, যাকে বলে এডুকেবল ও ট্রেইনাবল, তাই দ্রুত হস্তক্ষেপ এর কারণে ওকে সহজেই সঠিক পথে চালনা করা গেছে। এখন একটা ইন্টিগ্রেটেড স্কুলে পড়ে। ইশারাটাই বেশি পছন্দ করে। ঠাকুমার যদিও ওটাতে একদম পোষাচ্ছে না , যেকোনো সেই বাচ্ছা পাননি বলে আফশোস করেই যান। তা ওনাকে আর কে বোঝাবে যে একুশ নম্বর ক্রোমোজমের সেই তিনটে ইউনিট এক সাথে চলে এলে হয়ে যায় ডাউন্স সিন্ড্রোম। এ যেমন তরকারিতে নুন বেশি হলে কিছু করার থাকে না , তেমনটাই ক্রোমোজম পেয়ারিং গন্ডগোল হলে কারো কিছু করার থাকে না, অনেকসময় বংশগতও হয়। এটাই সংসারের নিয়ম।

****

এরমধ্যে একদিন বোসদিদা চলে গেলেন। হঠাৎ করেই। এখন সবুজ পরিবার নিয়ে পাহাড়েই থাকে। তা প্রায় ২৫ বছর হল। সবুজ এখন রিটার্ড, আর চাঁদ বা অবকাশ বোস এখন সুঠাম যুবক, ভালো জিমন্যাস্টিক করে এবং ভালো নাচ করে। গৌড়ীয় নৃত্য বিশারদ। সামনের সোমবার সবাই ওরা দিল্লি যাবে। ছেলে একটু অন্যরকম বাচ্ছা হয়েও গৌড়ীয় নৃত্যের জন্য জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছে , সেটা আনতে। পরের মাসে স্পেশাল ওলিম্পিকএও নির্বাচিত। আমরা সবাই শিওর সোনা জিতবে, যদিও রুপা হলেও ক্ষতি নেই। বিন্দিকে দেখে বোঝা যায় ধৈর্য্যধরে ঠিকপথে চ্যানেলইজ করতে পারলে সবই সম্ভব। তাই হাল ছাড়লে চলবে না। ওকে হ্যাটস অফ। ও অবশ্য স্বীকার করে যে বয়সে অল্প বড় বন্ধুটি না থাকলে হয়তো এতটা মনোবল পেতনা।

****

পাহাড়ে আজ পোস্টার পড়েছে অবকাশ ও আরো দুজনের। দিল্লি থেকে ফেরার পর বেশ কয়েকমাস অতিক্রান্ত এখন। বিন্দির চোখের দৃষ্টি কদিন হলো একটু ঝাপসা। কিন্তু খবর পেল অবকাশ সোনা পেয়েছে, চোখটা আরো ঝাপসা হয়ে উঠলো বিন্দির। শ্বাশুড়ীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বললো, "মা, দেখো আমি অপয়া নই। আমার চাঁদ এখন মধ্যগগণে, ঝলসানো উজ্বল। তুমি যেমন নুন বেশি হলে ঠিক করে দিতে ম্যাজিক করে, আমিও আমার চাঁদকে বিশ্বের মাখে মেলে ধরতে পেরেছি। আর দুঃখ রেখোনা। " চোখটা আরো ধরে এল বিন্দির, কিন্তু চমক ভাঙলো যখন হঠাৎ করে চাঁদ পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো, "আমি পেরেছি মা"। চোখ লুকিয়ে বিন্দি বলল , "ছাড় , কি খাবি বল? আজ তোরই দিন"।

বিচিত্র বর্ণপরিচয়

কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য

শিশুটি স্বভাব চঞ্চল। কোথাওই স্থির হয়ে সে বসেনা, নির্দ্দিষ্ট সময় অনুযায়ী কোন কাজই তাকে দিয়ে করানো যায় না। তবে খেলাধূলার প্রতি অনুরাগ একটু বেশী। আর আছে শিশু সুলভ আবদার - "যাকে সাদা ভাষায় বলে বায়না"। তবে সব ব্যপারেই সে উদাসীন নয়। হিসাব তার কড়ায় গণ্ডায় - বিশেষ করে তার প্রিয় কোন মিষ্টান্নের ব্যপারে। আর আছে পোশাক সম্বন্ধে সতর্কতা নাবলে পরিপাটি বলাই ভালো। স্নানঘরের বাইরে সে বেড়িয়ে আসে একেবারে শার্ট গুঁজে প্যান্ট পরে। তবে মুখেতার কথা বেশী নেই বা বেশী কথা বলাও সে পছন্দ করেনা।

এ হেনো শিশু ক্রমশঃ বড়ো হতে লাগলো। এবার সময় এলো তার শিক্ষা জগতে প্রবেশের। বাড়ির বড়রা যথাসাধ্য চেষটা চালাতে লাগলেন তাকে বর্ণ চেনাবার। আর সেও প্রতিজ্ঞা করে রইলো সে বর্ণের সাথে কোনো রকম পরিচয় করবে না। তার জন্য যা যা করার সবই সে করতে লাগলো যথাসাধ্য। এমনকি সরস্বতী পুজোর সময় দেবীর কাছে কোন বইও দিতে চাইতো না। শেষে হাল ধরলো তার এক দিদি -যে তাকে দেখাশুনা করতো। সে বইটা টেনে নিয়ে বলল -“ আয়তো ভাই আমরা পড়বো না”। শিশুটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে দিদির কাছে এসে বসলো। দিদি বললো-“ বল :আমরা অ বলবো না”। শিশুটিতো সোৎসাহে বলতে লাগলো-“অ বলবো না” দিদি বললো বল- “আ বলবোনা”। শিশুটিও তাই বলতে লাগলো। এমন সময় শিশুটির মা এসে দাঁড়ালেন তাদের কাছে। তখন দিদির নির্দ্দেশ মতো শিশুটি মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে জোড়ে জোড়ে বলতে লাগলো- “অ বলবোনা, আ বলবোনা”। দিদি বললো- “কোন অ টারে ভাই?” শিশুটি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো-“এই অ টা”। “ কোন আ টারে ভাই?” শিশু দেখায়- “এই আ টা”। এই কাণ্ড দেখে মা হাসলেন আর মনে মনে বললেন -“এর থেকে ভালো বা উচ্চমানের শিশুশিক্ষা পদ্ধতি আর হয়না। একেই বলে খেলার ছলে পড়া"। শিশুটি টেরই পেলোনা কখন তার বর্ণের সাথে পরিচয় ঘটে গেলো

চৈতন্যোদয়

সুশান্ত ভট্টাচার্য

তখন আমার বয়স তেত্রিশ ছুঁই ছুঁই। আমার ভাইপোর অন্নপ্রাশন। বাড়িতে উৎসবের মেজাজ। সবাই বাঁধ ভাঙা আনন্দে মেতে উঠেছে। ব্যতিক্রম শুধু অনুষ্ঠানের নায়ক - আমার ছোট্ট ভাইপো। সকলের আদরের বিড়ম্বনায় আজ সকাল থেকেই তার মেজাজটা ভাল নেই, সমানে কেঁদে চলেছে। ওর ছোটো ছোটো দাদা, দিদিরা তো কেউই বুঝতেই চাইছে না - অনাদর এক মস্ত স্বাধীনতা।

সকাল থেকে সাউন্ড বক্সে একটানা বেজে চলেছে - ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ ও ওস্তাদ বিলায়েত হোসেন খাঁর সানাই ও সেতারের যুগলবন্দী - গুর্জরী টোড়ি, ভৈরবী .....।

কেউ যে সে বাজনা শুনছে তা'নয় - সবাই যে যার মত ব্যস্ত। বাজনাটা যে চালাচ্ছে সে হয়ত ভাবছে - আমন্ত্রিতরা সানাই ও সেতারের যুগলবন্দী বেশ উপভোগ করছে! আর পাড়ার লোকেরা (যারা নিমন্ত্রিত নয়) সানাই শুনে বুঝতে পারছে - প্রতিবেশীর বাড়িতে একটা শুভ অনুষ্ঠান হচ্ছে।

এখনকার মত সেসময় অন্নপ্রাশন, বিয়ে বা অন্য অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং ব্যবসার চল ছিল না। তখন বাড়িতেই ভিয়েন হত - অনুষ্ঠানের আগের দিন সব ধরণের মিষ্টি তৈরি হতো ও পরের দিন রান্না হ'ত। বাড়ির কম বয়সী ছেলেরা ও তাদের পাড়ার বন্ধু-বান্ধবেরা কোমরে নতুন গামছা বেঁধে লেগে পড়ত পরিবেশনের কাজে। ফলে সবাই বেশ কব্জি ডুবিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাবার সুযোগ পেত।

আমিও লেগে পড়লাম পরিবেশনের কাজে।

তৃতীয় ব্যাচে আমার মা-বাবা ও বাড়ির সকলে খেতে বসেছে। আমার ওপর মাছ ও দই পরিবেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

মাছ পরিবেশনের সময় আমার মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বেছে বেছে একটা বেশ বড় সাইজের ল্যাজা মায়ের পাতে দিতে যাব ..... "বাবু, (মা আমাকে এই নামেই ডাকত) আমাকে ল্যাজা দিস নি, একটা দাগা (অনেকে গাদা বলেন) দে"। মায়ের কথাটা শুনেই মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথায় একটা চৈতন্যের বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল ....।

সংসারের টানাটানিতে মা কখনই কাউকে কোনোদিন বুঝতেই দেয়নি তার মনোগত ভাললাগা-মন্দলাগা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সাধ-বাসনার কথাগুলো। ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি - সবাইকে পরিবেশন ক'রে মা নিজের জন্যে ল্যাজাটাই রেখে দিত। ভাবতাম - মা ল্যাজা খেতে খুব পছন্দ করে, তাই সব সময় ল্যাজাটাই নিজের জন্যে রেখে দেয়। ভাইপোর অন্নপ্রাশনে অঢেল আয়োজন হয়েছে বলেই হয়ত মাকে মুখ ফুটে বলতে শুনলাম - "বাবু, আমাকে ল্যাজা দিস নি, একটা দাগা দে"।

এতকাল ধরে স্বার্থপরের মত মায়ের স্নেহ-ভালবাসা চেটেপুটে ভোগ করে এসেছি। কিন্তু নিজেকে বঞ্চিত করে হাসিমুখে দিনের পর দিন মায়ের আত্মত্যাগ এ অধমের মানস- চোখে কখনও ধরা পড়েনি! আজ, মায়ের ওই একটা ছোট্টো চাওয়া এক লহমায় আমার চেতনায় চৈতন্য এনে দিল। এতদিন পরে মায়ের মনের মন্দিরে একটু উঁকি দেবার কথা আমার মনে উদয় হল!

ভাবতে অবাক লাগে - দীর্ঘ তেত্রিশ বছর সময় লাগল - আমার চৈতন্যোদয় হ'তে, আমার মা-কে নতুন ক'রে চিনতে!

All Eyez on me

My Mini Me

By Paromita Roy

By Diganta Banik

Matri Bandana
By Santanu Bose

By Debdutta Panigrahi

Manglajodi,Odhisha

Rajgad fort, Pune

By Kalyan Halder

By Mousumi Biswas

By Pratyusha Sarkar

আদিম জানলা ও সমুদ্র পার্বণ

প্রত্যূষা সরকার

ব্যাকস্পেসে উপসংহার
হামাগুড়ি মেঘ জানে পুণর্জন্মের কথা

তুমি ঝিনুক খোপে সমুদ্র বাষ্প
উঠে দাঁড়ানোর পর চিবুকে মাদুর বিছিয়ে দাও

একেই বোধহয় নির্মাণ বলে
শরীর জোড়া সমুদ্র-গন্ধ...

বেশ খানিকটা এগিয়ে ফেলেছি পাণ্ডুলিপি... এ সময় চুপ করে থাকার সময়। সমুদ্র বেশি করে গর্জে উঠলে আমি আরও বেশি চুপ হয়ে যাই। মনে পড়ে, আড়াই বছর বয়েসে প্রথম 'অনেকগুলো জল' দেখার অভিজ্ঞতা। পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, মুম্বাই, গোয়া, পণ্ডিচেরি, অথবা চেন্নাই, কেরল, আন্দামান, কণ্যাকুমারিকা... সমস্ত নোনাজল একসাথে এসে ক্রমশ ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাকে। ঘড়িতে সাতটা বাহান্ন, এবার উঠতে হবে বিচ থেকে। বৃষ্টি বাড়ছে। এমনিতেই তাজপুর বড্ড ফাঁকা। চায়ে শেষ চুমুক দেওয়ার আগে আরও একবার 'অনেকগুলো জল'-এর সাথে বাবাকে ভাববো... আমার বাবাই আমাকে প্রথম সমুদ্র চিনিয়েছিলো।

আজ ২৬শে জুলাই। আকাশে অসংখ্য ধোঁয়া। এর মধ্যে বাবার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পিপিই কিট পরা লোকটার পক্ষে ক্রেমাটোয়াম থেকে সমুদ্রে ফেরা সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে আমার ঠিক সামনে আমার একমাত্র বন্ধু, সৈকত... আমার বন্ধু বেশি, হাসবেন্ড কম। নামের সাথে সমুদ্র ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকায় এখানেই মন কেমনের আস্তানা খুঁজে নেয় ও। ডাইরিটা আপাতত বন্ধ করছি। প্রচণ্ড বৃষ্টির ছাঁট... কালি গলছে, ফুরিয়ে আসছে বালির সংখ্যা। এবার না উঠলে টেউয়ের ধাক্কায় মাচাটা প্রচণ্ড নড়বে। আমরা ভিজতে থাকবো। পেরিয়ে যাবো আদিম জানলা ও সমুদ্র পার্বণ।

শুরুটা ঠিক এরকম নয়। ডাইরির পাতা ছেঁড়ার অভ্যেস আমার বহুকালের। বাবা বকতো। এই ডাইরিটা চার মাস আগে বাবার অফিসের ব্যাগ থেকে ঝেপেছিলাম... এসব ঝাপটাপ আমার সহজাত। সে যাই হোক। কল্যাণী থেকে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় মণিকাঞ্চন (বাস)। সৈকত আগের দিন টিকিট কেটে রেখেছিলো। সময় বুঝে আমার কোভিডের ডাক্তার আর সাইকোলজিস্টের পরামর্শও নিয়ে নিয়েছে। আমি জানতে পারলাম ঠিক ওইদিন। কোনোরকম প্রিপারেশন ছাড়াই ছুটি কাটাতে ডাইরেক্ট তাজপুর... ও জানে, সমুদ্রে সমস্ত ক্যাথারসিস উগড়ে দেওয়া যায়।

ছ'ঘন্টা পেরিয়ে আমাদের ডেস্টিনেশান বালিশাই। মাঝখানে দশ মিনিট কোলাঘাটে নেমে একটু আরমোড়া ভেঙে নিয়েছিলাম আর কী। বালিশাই থেকে একটা অটো বুক করলাম দুজনে। প্রথম পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেও তারপর লাফাতে লাফাতে বাকিটা রাস্তা... ড্রাইভারের কথায় বুঝলাম, বড়ো বড়ো মালবাহী ডাম্পারের ভারে রাস্তাটার আর কিছু অবিশিষ্ট নেই। রাস্তার দুপাশে ঝিল। বর্ষার আদরে একদম নীল রং। গভীরতা দেখলে গা ছমছম করছে। পনেরো মিনিটের পথ আরও তিরিশ যোগ করালো। এই পাঁচ কিলোমিটার কোনোরকমে

গণপতির নাম জপতে জপতে অবশেষে পৌঁছালাম হোটেল চত্বরে। সৈকত বহুবার মিউজিক ভিডিও আর শর্টফিল্মের শ্যুটে আসায়, ওর এ জায়গায় পরিচিতি বেশ। হাত-মুখ ধুয়ে আগে চিংড়ির মালাইকারি দিয়ে এক থালা গরম ভাত সাবড়ে নিলাম। তারপর স্নানের কেস। পেটে কিছু না পড়লে মেজাজ আমার উত্তুঙ্গে থাকে।

হোটেল থেকে বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে বিচে যেতে হয়। আমাদের হোটেলের সামনে আবার ঝাউবনের ভেতর দিয়ে একটা গুপ্ত গলি আছে। যদিও আমফানে সমস্তটাই শেষ। বেশকিছু বড় বড় গাছের গুঁড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখনও। সরকারি সহায়তায় অনেকগুলো নতুন গাছও পোঁতা হয়েছে, গরুদের ভয় কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সম্পূর্ণ ঘেরা। কাঁটাতার টপকে, কাদাজল মেখে একবার সমুদ্র দর্শন করে এলাম। বিচ ধরে বাঁ দিকে হেঁটে গেলাম টানা আধ ঘন্টা। ওখানে তাজপুরের প্রথম বিচ। সমুদ্র যদিও ছুটি নিয়েছে অনেকদিন। মরুভূমিতে মরুদ্যান হিসেবে শুধুমাত্র "বিশ্ব বাংলা", এছাড়া ওখানে কোনোকিছুই অবশিষ্ট নেই।

আস্তে আস্তে অন্ধকার নামছে তখন। ঘড়ি দেখতে মনে নেই। দুজনে ছাতা খুললাম। পিচ রাস্তা ধরে এগোতে গিয়ে দেখি বেশিরভাগ হোটেলের গায় জংলি গাছ, ভাঙাচোরা ঘরদোর। একেই কি ধ্বংসাবশেষ বলে? ঠিক দশ বছর পর আরও একটা মহেঞ্জোদারো? আরও একটা ইজিপ্ট কিংবা মেসোপটেমিয়া? আমি চোখ বন্ধ করলাম... মনে পড়লো, ২০শে মে, ২০২০। মা বাবা বোনকে জাপটে ধরে ডাইনিঙে বসেছিলাম। অন্ধকার ঘর। সোঁ সোঁ শব্দ হাওয়ার। একটা ঝড় কতটা বিধ্বংসী সেটা তাজপুরকে এতো কাছ থেকে না দেখলে হয়তো বুঝতাম না! গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে গেছে বন্যায়। টিন খড় টালি সমস্ত উড়িয়ে নিয়ে কোথায় যে ফেলেছে, সে কথা কথায় কথায় চাপা পড়ে গেছে সমুদ্রের তলানিতে। আমি সমুদ্রের থুতুতে "ক্যান্টারবেরি টেইলস" দেখছি তখন... সমস্ত সাজানো শব্দ সত্যি হয়ে উঠছে ঢেউয়ের খসখসে শব্দে।

এ সময় আমার যাবতীয় দাগ তুচ্ছ। একটা হালকা হাওয়া। শীত শীত চোখ-মুখ। আমরা হাঁটছি তো হাঁটছিই... হোটেলে ফিরে ভোম্বলদার হাতে কড়া করে আদা চা পমফ্রেট ফ্রাই খেতে খেতে দু-ফর্মার পাণ্ডুলিপি শুনিয়ে ফেললাম সৈকতকে। ঘন্টা দুয়েক পর ডিনার। তারপর একটা পৈশাচিক ঘুম। ঘুমের ভেতরে অনেকদিন পর কোনও স্বপ্ন নেই। কোনও আওয়াজ নেই... শুধুই নিস্তব্ধতা। গত তিন মাসে যা কিছু বদলেছে, সবটাই সমুদ্র হয়ে হয়তো ফিরে আসবে কখনও!

আজ ঘুম থেকে উঠে পড়েছি সাড়ে ছটায়। সানরাইজ হয়েছে, আমরা দেখতে পাইনি। মেঘ দায়িত্ব নিয়ে ঢেকে রেখেছে গোটা আকাশ। ঝমঝমিয়ে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। হাওয়ার ভেতর বনফুলের গন্ধ। আমি প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নিলাম। ইনহেলারটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো সৈকত, আমি দিব্যি দেখেছি। বালির মধ্যে লাল কাঁকড়ার ছটফটানি আর নানান রকম ঝিনুক দেখতে দেখতে কাটিয়ে দিলাম অনেকটা সময়। আসলে সময় বড্ড দৌড়াতে থাকে, ওল্টানো নৌকায় হাঁপ ছাড়ে জীবন! বালিঘড়ি মৃত্যুকে বন্ধু করে নেয়।

মৃত্যু সময়ের দাস, না সময় মৃত্যুর?
নীল হয়ে যায় অবয়ব...
গাঢ় চোখে এখনও মেঘ ছোঁয়া বিকেল-টান
শোনার পরেও অনেক না শোনার দাবি
মিশে থাকে নেশা
অথবা চোখ ফোটা বিশ্বাস...

ঢেউয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়ছে তখন। জোয়ার এসেছে সবে। আমরা ডানদিক ধরে হঁটতে হাঁটতে সেই গোপন পথ হারিয়ে ফেলেছি। মোবাইলে নেটওয়ার্ক নেই। ভাঙাচোরা গাছ আর গোটা দশেক কুকুর ছাড়া, কেউ নেই। সমুদ্র এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই। আমার পা টলছে। মনে হচ্ছে, ভেসে গেলে ভেসে যাবো... সবাই যেতে পারেনা। আমি তো সমুদ্র ভালোবাসি। অথচ বুকের বাঁদিকটা ঢিবঢিব করছে। মাথার মধ্যে কিলবিল করছে ভেসে না যাওয়ার ইচ্ছে। সৈকত হাত ধরে টানতে টানতে পেছন দিকে হাঁটছে। পাশে কাঁটাতার, অসংখ্য

কাঁটাগাছ। সমুদ্র হাঁটুর কাছাকাছি তখন... আমরা আশ্চর্য আরব্যরজনীর সামনে বঙ্গোপসাগরীয় সকাল। হদিস পেলাম পথের। বুঝলাম, হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেও একটা পজিটিভ এনার্জি কাজ করে। চাইলেই হারিয়ে যাওয়া যায় না।

হোটেলে এসে ডিম সিদ্ধ, পাউরুটি আর কফি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে বিচ ধরে আবার হাঁটা শুরু করলাম। যে পথে হারিয়েছিলাম, সেই পথই এখন পথপ্রদর্শক। সূর্যবাবু হালকা হালকা বেরিয়েছেন। সমুদ্রও পিছিয়ে গেছে অনেকটা। হলুদ বালিতে বিন্দু বিন্দু জলছাপ। প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার পর বুঝলাম, অনেকটা হেঁটে ফেলেছি। পৌঁছালাম চাঁদপুর গ্রামে। সবেমাত্র নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলো গ্রামবাসী। আমফান জাস্ট পিষে মেরে ফেলেছে ওদের আনন্দ হাসি আবেগ, সবকিছু। সরকারের তরফ থেকে বোল্ডার ফেলে নতুন টুরিস্ট বিচ তৈরি হচ্ছিলো ওখানে। তবে প্রকৃতির কাছে মানুষ কিছুই না! মানুষ শুধু হাতের পুতুল... গ্রামের মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলে মনে হলো, এই অসহায়ত্ব কীভাবে কবে ঘুচবে সত্যিই সেকথা কেউ জানে না। প্রতি বছর বর্ষায় বন্যা হতো বলেই সমুদ্র আটকানোর পরিকল্পনা ছিলো সরকারের। কিন্তু ওই যে... সমুদ্র তো, তাকে কী দিয়ে আটকানো যায় বলুন তো! এই সৃষ্টির ধ্বংস আরও বেশি করে ধ্বংস ডাকতে পারে।

বিকেল নামার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র খুব চুপচাপ আজ। কাল সকালেই ফেরার পালা। গাংচিলের পিকনিক দেখতে দেখতে সন্ধে হলো। শুনশান। স্তব্ধ। এখানে সমুদ্র ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বাঁদিকে তাকালে দূরে অসংখ্য আলো... ওটা মন্দারমণি। তাজপুরে আলো নেই। দীঘার মতো হৈচৈও একদম নেই। এ সমুদ্র বড়ো অভিমানী। শূন্যের ভাঁজে মিনিটে মিনিটে রং বদলায়। নিজেই এসে হাত ধরে। নিজেই ছেড়ে চলে যায়...

ভেবেছিলাম, বাবাকে একবার তাজপুর নিয়ে আসবো। মন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুনবো ঢেউ আর আমরা। বাবা আমার সাথে কখনও সমুদ্রে আসেনি। আমি বাবার সাথে গেছি... আজ ২৬শে জুলাই। আকাশে অসংখ্য ধোঁয়া। ঠিক তিন মাস আগে, একটা থমথমে সন্ধে... বাবা হসপিটালের বেডে, অক্সিজেন লেভেল মাত্র পঁয়ত্রিশ। তারপর শূন্য থেকে শূন্যে ঢেউয়ের মতো তলিয়ে গেছে শরীর।

আমার সামনে একটার পর একটা ঢেউ জন্মাচ্ছে এই মুহূর্তে। আমি জন্ম দেখছি, মৃত্যু দেখবো না বলেই।

রঞ্জুদা ও গন্ধ অবিচার

ভাস্কর দাশগুপ্ত

আজ তোতনের বাড়িতে লোক আসবে। মা সকাল থেকেই ব্যস্ত রান্নাঘরে, নানারকম মেনুর মধ্যে তোতনের প্রিয় বিরিয়ানি তো আছেই। সেই গন্ধে ম ম করছিলো সারাঘর এতোক্ষণ, আর কিছুটা অন্যমনস্ক হয়েই টিভি চালিয়ে একটা কিছু আঁকার চেষ্টা করছিলো তোতন। টিভিতে ক্রিকেট খেলা চলছিল বটে কিন্তু আঁকার দিকেই মন তোতনের। হঠাৎ জানলা দিয়ে মৃদু একটা ডাক এলো কানে, বিল্লু। "কিরে? কিসব করছিস? মাঠে আয়, আজ পটলা নতুন ব্যাট এনেছে।" আড়চোখে রান্নাঘরের দিকে তাকাল তোতন, এক সাথে অনেক কিছু রান্নায় ব্যস্ত মা। তারপর কোনোমতে বাইরে যাবার মত একটা কিছু পরে, মার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,

- "মা, কোনো কাজ আছে এখন, নাহলে আমি মাঠে যাই "।

- "না, এখন জ্বালাস না, খেলতে যা"।

যাক নিশ্চিন্ত, মনে মনে একটু হাসলো তোতন। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফ্ল্যাটবাড়ির দরজা পেরিয়ে লেকএর মাঠের দিকে হাটতে লাগল তোতন। তোতনদের ফ্ল্যাটটা গড়িয়াহাট এর কাছাকাছি, স্থানীয় মাঠ বলতে লেক। মাঝে রাস্তাটা পেরোলেই, বঙ্কুবাবুর বইয়ের দোকানের পাশ দিয়ে গলিটা নিলেই মাঠের শর্টকাট। বইএর দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা তীব্র একটানা আওয়াজ দোকানের ভিতর থেকে পেল তোতন, নিশ্চই রঞ্জুদা কিছু একটা করছে। এই রঞ্জুদার প্রতি তোতনের আগ্রহ বেশ বেশি। উঁকি মেরে দেখল তোতন, মেঝের উপর হাঁটুগেড়ে বসে কিছু একটা গ্রিল করছে রঞ্জুদা। আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। - "ও রঞ্জুদা, কি করছো গো?" তোতনের প্রশ্ন। রঞ্জুদের চোখে একটা চশমা, মনে হয় ওই গ্রিলিং এর জন্য। চোখ থেকে সেটা নামিয়ে রঞ্জুদা বললো,

- "কি রে তোতন। কি জামা পরে আছিস। এতো গন্ধ?"

- "গন্ধ? কই আমি তো কিছু পাচ্ছি না। "

-"হুমম", বলে গ্রিলিং মেশিন টা পাশে সরিয়ে রাখলো রঞ্জুদা, "এদিকে আয়।"

এই "এদিকে আয়" টার মানে তোতন জানে, কিছু একটা জ্ঞান পাবে ও, এবং সেটা তোতনের রসদ, এই করেই বন্ধুমহলে বেশ সবজান্তা গোছের তোতন।

এখানে রঞ্জুদা ও বঙ্কুবাবুর দোকান এর একটু পরিচয় না করিয়ে দিলেই নয়। গড়িয়াহাটের মোড়ের কাছে দোকান বঙ্কুবাবুর, বিলক্ষণ বইয়ের দোকান, কিন্তু বিক্রির জন্যে নয়। "বইয়ের দোকান করবেন, কিন্তু বিক্রি করবেন না, এরকম উৎকট শখ কেন?" পাশের পানের দোকানের মনোতোষ যখন জিজ্ঞেস করেছিল তার আগে বঙ্কুবাবু আইডিয়াটা বলছিলো মনোতোষকে। কলকাতার টলিপাড়ায় যোগাযোগ আছে বঙ্কুবাবুর। সেখানে নানারকম শুটিং চলে এবং মাঝে মাঝেই যেটা দরকার পরে তা হলো বইয়ের, সিরিয়াল বা সিনেমার কোনো দৃশ্যে প্রায়ই দেখা যায় ঘরভর্তি বই, নায়ক বা নায়িকাকে একটু জ্ঞানীগুণী নাকি দেখায় তাতে। কথা হলো এতো বই এর যোগান দেবে কে? এই আইডিয়া ক্লিক করে বঙ্কুবাবুর মাথায়। স্থানীয় কয়েকটা প্রায় উঠে যাওয়া লাইব্রেরি থেকে পাইকারি দরে হাজার তিরিশেক বই কেনেন বঙ্কুবাবু, রোগা মোটা সরু লম্বা বাঁধানো বা মলাট দেওয়া নানান সাইজের বই, তার বিষয়বস্তুর দিকে এতটা নজর নেই বঙ্কুবাবুর। লাইব্রেরি গিয়ে বই আর তেমন কেউ পড়ে না, খুব কম ক্যাপিটালেই ব্যবসা শুরু বঙ্কুবাবুর। রঞ্জু ওর দোকানের কর্মচারী, মেদিনীপুর নাকি পুরুলিয়া নাকি বাঁকুড়া, কোথা থেকে যেন এসেছে রঞ্জু, বঙ্কুবাবুর মনে নেই, আর রেখেই বা লাভ কি। নামমাত্র বেতন রঞ্জুর, দোকানেই থাকে, পাশের ভাতের হোটেলে খাওয়াটা বেতন এর মধ্যেই যোগ করা

আছে। রঞ্জু লেখাপড়া জানে, গ্রামের স্কুলেই পড়েছে, সেইটুকু জ্ঞান আছে এই চুক্তিতেই এই চাকরিটা হয় রঞ্জুর। পড়াশোনা ভালোই লাগে রঞ্জুর, দোকান ভর্তি বই, এই নিয়েই বেশ আছে।

-"নিজের গায়ের গন্ধ তুই পাবি কেন? কিন্তু এখানে আর কিছু গন্ধ পাচ্ছিস কি?" রঞ্জু জিজ্ঞেস করলো তোতনকে।

-"হ্যাঁ, ওই যে ফেভিকলটা খুলে রেখেছো ওদিকে।" তোতনের উত্তর।

উঠে গিয়ে ফেভিকল এর ঢাকনাটা বন্ধ করতে করতে রঞ্জু বললো, "তা তুই নিজের গায়ে পড়া জামার গন্ধ পাবি কি করে? তোর নাক সেই গন্ধ নিতে ইচ্ছুক নয়।"

"নাকের ইচ্ছে?" ফিক করে হাসলো তোতন।

- "নাকের মানে তোরই ইচ্ছে ওটা। নাক তো তোর ছটা ইন্দ্রিয়র একটা। তা এই ছটা ইন্দ্রিয় কি সব সময় সমান ভাবে কাজ করে যাবে নাকি? মারা পড়বি তো তবে।"

-"মানে?"

খোলসা করতে শুরু করে রঞ্জু, "আমাদের দেহে ছটা ইন্দ্রিয়, তাতো জানিস? এবার এই ইন্দ্রিয়গুলোর কাজ কি? এদের কাজ হলো আমাদের চারপাশে যে নানা রকম এনার্জি মানে শক্তি ছাড়িয়ে রয়েছে সেগুলোকে টের পাওয়া। যেমন মনে কর তুই দেখতে পাস কি করে?"

ক্লাস ৮ এর ছাত্র তোতন, এটা জানা আছে ওর, "কেন কোন জিনিসের উপর আলো পড়লে সেখান থেকে আলো ঠিকরে এসে আমাদের চোখে পড়ে, আর আমরা সেই জিনিসটাকে দেখতে পাই।"

-"ঠিক, কিন্তু আলো এক ধরনের শক্তি সেটা জানা আছে নিশ্চই। সেটা চোখে পড়লে কি হয়?"

ঘাড় নাড়ল তোতন, সিলেবাসের বাইরে এটা।

রঞ্জু বলে চলে, "চোখে আছে এক ধরনের লেন্স, সেই লেন্স ভেদ করে আলো চোখের পিছনে কিছু কোষকে উজ্জীবিত করে, মানে সেই কোষ গুলোর ভিতরে কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। কোষ কি সেটা জানিস না বলিস না।"

জানে তোতন। এই নিয়ে বিস্তর কথা হয়েছে ওর এই রঞ্জুদারই সঙ্গে। সম্মতি জানায় ও।

-"তাহলে আলোক শক্তি চোখের মধ্যে পড়ে কোন রকম শক্তি হয়ে গেল তোতন?"

-"রাসায়নিক শক্তি।" উত্তর দিল তোতন।

আস্বস্ত হলো রঞ্জু, এবং এগিয়ে চলল, "চোখের মধ্যের ওই রাসায়নিক বিক্রিয়া আশেপাশে থাকা স্নায়ুকোষ গুলোকে উত্তেজিত করে, যা পরিবাহিত হয়ে মগজ অব্দি পৌঁছে যায়। এই উত্তেজনা পরিবাহিত হয় বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা। অর্থাৎ আলোক শক্তি শেষমেশ বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত হলো। আসলে এটা চোখ দিয়ে বোঝালাম, কানের ক্ষেত্রেও তাই - শব্দ শক্তি শেষমেশ বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত হয়। জিভ আর নাকের ক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি হয়ে যায় বৈদ্যুতিক শক্তি। মগজ শুধু চিনতে পারে বৈদ্যুতিক শক্তি।"

-"নাক এর ক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি কেন?" প্রশ্ন তোতনের।

-"সব গন্ধই তো কোনো না কোন রাসায়নিক রে। আমাদের নাক খুবই শক্তিশালী। মানুষেরা ১ ট্রিলিয়ন রকম গন্ধ অনুভূতি করতে পারে। ১ ট্রিলিয়ন মানে কটা শূন্য বলতো এক এর পর?"

-"মিলিয়ন মানে ৬ টা, তার উপর বিলিয়ন মানে ৯টা..." তোতন গুনতে থাকে।

-"ট্রিলিয়ন হলো বিলিয়ন এর পরের ধাপ..", ধরিয়ে দেয় রঞ্জু।

-"১২ টা আছে ট্রিলিয়ন এ", তোতন বলে।

-"কিন্তু এবার ভাব তোতন, এতো রকম গন্ধ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে, সব কিছুই তোর নাক দিয়ে ঢুকছে, মগজের তো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, এতো রকম অনুভূতি, আমরা তো পাঁচ মিনিটেই ক্লান্ত হয়ে যাবো রে।" রঞ্জু হাসতে হাসতে বললো।

-"তা তো ঠিক। সব গুলিয়ে দিচ্ছো রঞ্জুদা, এই বলছো নাক খুব শক্তিশালী, আবার এই বলছো

ক্লান্ত হয়ে যাবে।"

-"ধর তোর কাছে একটা খুব ধারালো ছুরি আছে যা দিয়ে সব কাটা যায়, কিন্তু আছে বলেই যে তুই তোর চারপাশের সব কিছু কাটতে শুরু করিস একটু পরেই হাপিয়ে যাবি যে।"

-"সব কাটবোনা তাহলে, আমাকে যদি বল যেটুকু না কাটলেই নয় সেটুকুই কাটবো।" বলল তোতন।

-"খুব ভালো তোতন। আমাদের মগজটাও ঠিক তাইই করে, প্রথম প্রথম নাক থেকে আসা সব গন্ধকেই বিচার করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরই বুঝতে পারে যে গন্ধগুলো আসছে, তা সবই একরকম, তাই এগুলোকে অবিরামভাবে বিচার করে যাবার আর দরকার নেই। নাকে আসা প্রথমের সব গন্ধগুলোকে ব্যাকগ্রাউন্ড এ পাঠিয়ে দেয় আমাদের মস্তিস্ক। ব্যাকগ্রাউন্ড এর বাংলা কি বল তো?"

একদম জানে না তোতন।

-"পটভূমি।" রঞ্জু নিজেই উত্তর দিয়ে দেয়, "আর এই সব অনুভূতিকে ব্যাকগ্রাউন্ডে পাঠিয়ে দেয়াটাকে বলে ব্যাকগ্রাউন্ড সংশোধন। আমাদের মাথায় এই ব্যাপারটা সবসময় চলে। সব একরকম অনুভূতি গুলোকে বিরক্তিকর ঘোষণা করে আমাদের মাথা অপেক্ষা করে বসে থাকে নতুন কিছুর জন্য, যেমন নাকে আসা নতুন কোনো গন্ধ।"

এবার খানিকটা বুঝেছে তোতন, "মানে সব গন্ধ বিচার করি না আমরা, অবিচার করি বরং।"

-"অবিচার টা বেশ মজাদার লাগলো, বিচারবিমুখতা বললে ঠিক হয়", হাসল রঞ্জু।

-"তা সে জন্যই কি আমি আমার জামার গন্ধ পেলামনা, ওটা পেয়েছিলাম হয়তো পরার সময়, কিন্তু তারপর ওটা ব্যাকগ্রাউন্ড এ চলে গেছে ", একটু উত্তেজিত তোতন, "আর তুমিও পাচ্ছিলে না ফেভিকল এর গন্ধ। কিন্তু তুমি আমার জামার গন্ধ, আর আমি ফেভিকল এর গন্ধ সহজেই পেলাম। আমার মাথার কাছে ওগুলো নতুন।"

-"একদম", সম্মতি রঞ্জুর।

-"তা এটা কি শুধু নাকের ক্ষেত্রেই নাকি অন্যগুলোর জন্যেও?"

-"নাক, কান, আর আমাদের ত্বক। ভেবে দেখ, প্রথম তুই যখন কোনো জামা প্যান্ট পড়িস তখন ফিল করতে প্যারিস জামাপ্যান্ট এর অস্তিত্ব, তারপর গা-সওয়া হয়ে যায়।" রঞ্জু বলে।

-"আর আমিও সকালে টিভি চলছিল বটে, কিন্তু একটুও কান না দিয়ে আঁকছিলাম। টিভির আওয়াজ টা কান দিয়ে ঢুকছিল বটে কিন্তু ওটা ব্যাকগ্রাউন্ড এ চলে গেছিলো। " তোতনেই উৎসাহ ধরছে না।

-"ধরে ফেলেছিস"।

-"কিন্তু রঞ্জুদা, চোখের ক্ষেত্রে কি হবে এরকম।" জিজ্ঞেস করে তোতন।

-"না রে, চোখের ক্ষেত্রে এটা খাটবে না, চোখ বড্ড অনুভূতিশীল যাকে বলে। কিন্তু ভেবে দেখ সেই জন্যেই চোখে পাতা আছে। বিরক্তিকর লাগলে চোখ বন্ধ করে রাখতে পারবি।"

-"এত বুদ্ধি আমাদের।" অবাক হয় তোতন।

-"বুদ্ধি না বলে, এত সুষমভাবে তৈরি আমরা বল। এমনি এমনি কি অ্যামিবা থেকে মানুষ হয়েছি। তবে সবসময় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো এমন ব্যাকগ্রাউন্ড সংশোধন করতে পারে না, আর সেটা একটা রোগ হতে পারে।" রঞ্জু বলে।

-"কি রোগ?"

-"হাইপেরএসথেসিয়া, যা হলে আমাদের সব কটা ইন্দ্রিয়ই সর্বদা সজাগ হয়ে থাকে।"

অনেক কিছু জমে গেছে তোতন এর মাথায়। এবার ওগরাতে হবে। বিল্লু, পটলা, ওরাই ওর রিসিভার।

-"কি রে? অন্যমনস্ক হয়ে গেলি। দেখ আমার কথা শুনতে শুনতে এবার যদি বোর লাগে, তবে আমাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে পাঠাবার আগে খেলতে যা।" রঞ্জু গ্রিলিং মেশিনটার দিকে হাত বাড়াল।

দোকান থেকে বেরিয়ে এল তোতন। একটু জামার গন্ধটা শোঁকার চেষ্টা করল। বিল্লুর পেলেই হল, তাহলেই এই সব জ্ঞান দিয়ে, ..., হু হু, পটলা আজ নতুন ব্যাট এনেও হিরো হতে পারবে না।

বুড়ো আঙুল

সৌম্য দাশগুপ্ত

বুড়ো আঙুলকে যে কেন 'বুড়ো' বলা হয় সেটা কোনদিনই আমার মাথায় ঢোকেনি। বলি··· আমার সবকটা আঙুলের বয়স তো সমান, তাহলে খামোখা একটা আঙুলকে এই রকম 'সিনিয়র সিটিজেন' মার্কা তকমা দেওয়ার কোনও যুক্তি আছে কি?

তবে একথা আপনাকে মানতেই হবে যে বয়সের ভারে না হলেও অন্তত 'পাবলিসিটির' ক্ষেত্রে এই 'বুড়ো' বাকি সব খুচরো খোকাদের বলে বলে দশ গোল দেবে। বিশ্বাস না হলে খবরের কাগজ খুলুন — কোথাও এই আঙুলেই চোট পেয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাচ্ছে ভারতের নির্ভরযোগ্য ওপেনার, কোথাও আবার সরকারী নিয়মকে এই আঙুল দেখিয়েই বাইকে প্রচার চালাচ্ছে 'হেলমেটবিহীন' রাজনৈতিক দল, কোথাও আবার নরম পানীয়র বিজ্ঞাপনে এই আঙুল দেখিয়ে নায়িকাসমেত এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে দামাল নায়ক, আবার কোথাও এই আঙুল ঘিরেই জ্যোতিষবিদদের মধ্যে চলছে ভবিষ্যৎ বলার কম্পিটিশন। আর সাবেক পৃথিবীর ফেসবুক---? সেখানেও তো এই আঙুলের রমরমা। ভোরের হাই তোলার দৃশ্য থেকে রাতের ডিনারের আধ পোড়া ডিমের ডালনা --- 'লাইক' নামক উৎসবে এই আঙুলের জয়জয়কার সর্বত্রই।

আর আমার ক্ষেত্রে এই আঙুল তো ছিল ছেলেবেলার সুখনিদ্রার নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। তবে সেই 'নির্ভরযোগ্য সঙ্গী', আজ আমার এই প্রাক 'সিনিয়র সিটিজেন' মার্কা জীবনে যে এমন ভেলকি দেখাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। মাত্র একদিনের ব্যাপার জানেন····· তাতেই আমার জীবনের তেরোকলার দফারফা। গতকাল রাত্রে ভেবেছিলুম সুইসাইডই করব···। কিন্তু···।

অন্যের জীবনের সমস্যার কথা শুনতে কার না ভালো লাগে বলুন! খুব বুঝতে পারছি···আপনিও সেই 'ভালো কিছু' পাওয়ার আশাতে এই মাত্র নড়েচড়ে বসলেন। বেশী সময় নেব না আপনার। শুধু গতকালের মাত্র দুটো ঘটনার কথা বলব । তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন সুইসাইড করার কথা ভেবেছিলাম । গতকাল ছিল শুক্কুরবার — অফিসে ডুব মেরে সারাদিন ল্যাদ খাওয়ার প্ল্যান । তবে সকালে একবার যেতে হয়েছিল ছেলের স্কুলে। কারণ আমার গুণধর পুত্রটির হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার রেজাল্ট এবং গার্জেনকে 'জরুরি তলব' । বলতে বাধা নেই, আমার পুত্রটি এক অতি বিরল প্রজাতির উচ্চিংড়ে প্রাণী। সে হাঁটে না — লাফায়। কথা বলে না — ষাঁড়ের মত চিৎকার করে । আর পড়াশুনো? সেটি তার জীবনে এক প্রাঞ্জল রসিকতা । এবারেও ইংরেজি, অঙ্ক আর জীবন বিজ্ঞানে তিনি 'অত্যন্ত ভালো পরীক্ষা' দিয়েও ফেল করিয়াছেন । আপাতত প্রধান শিক্ষিকার পাশের ঘরে আমাদের 'কাঠগড়া' । 'আমাদের' মানে আমি আর আমার ঐ 'উচ্চিংড়ে' এবং সঙ্গে সমমানের কিছু 'উচ্চিংড়ে' সমেত তাদের জন্মদাতা আর জন্মদাত্রীরা । সামনের টেবিলে বসা দুই দিদিমণির তীক্ষ্ণ মন্তব্যের সামনে তখন 'কাঠগড়ায়' দাঁড়িয়ে আমি আর আমার উচ্চিংড়ে । গত কয়েক বছরে এই 'পিচ' আমার বিলক্ষণ চেনা । প্রথম পর্যায়ে দিদিমণিদের রকেটের গতিতে আসা তীক্ষ্ণ মন্তব্য গুলো মাথা নিচু করে 'ছেড়ে দেওয়া', মধ্যে কিছু এদিক ওদিককার কথা বলে 'বল নষ্ট' করা আর শেষ পর্যায়ের 'মন্থর পিচে' কিছু খুব চেনা উপদেশবাণীতে 'হ্যাঁ বাচক মন্তব্যে 'ইনিংস' শেষ করা । সেই মতই 'ব্যাট' করছিলাম — কিন্তু একটা বাউন্সার হেলমেটে লাগতেই' বুঝলাম ব্যাপারটা অন্য দিকে যাচ্ছে ।

'আমরা এতদিন ভাবতাম সমস্যাটা আপনার ছেলের। কিন্তু আপনার ডেটা তো অন্য কথা বলছে মিঃ সরকার। আপনি তো

নিজেই অঙ্ক আর ইংরেজিতে সারাজীবন কোনওমতে পাশ করে এসেছেন। মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় তো একবার টুকলি সমেত বামাল ধরাও পড়েন। আর ডিসিপ্লিন বস্তুটা যে আপনি কোনওকালেই মানেন নি সেটা আপনার স্কুল রেকর্ডই বলছে। ক্লাস এইটে, স্কুলের গাছের জামরুল পাড়তে গিয়ে আপনার ঢিলের আঘাতে একটি ক্লাস ফাইভের বাচ্চার মাথা ফাটে। আর ক্লাসে অসভ্যতামির জন্যে নীলডাউন আর বেতের বাড়ির কথা তো ছেড়েই দিলাম। আপনার এই ছেলের থেকে আপনি এর থেকে আর বেশী কি আশা করেন মিঃ সরকার?'

আর মিঃ সরকার? সরকারের ভিত তখন টলমল। হাঁটু কাঁপছে, মাথা ঘুরছে। ওনার বলা কথা গুলির একটিও যে মিথ্যে নয় সে আর আমার থেকে ভালো কে জানে। কিন্তু ছেলের স্কুলের কাছে আমার স্কুল কাহিনী, মানে বিশেষ করে ঐ জামরুল গাছের ঘটনাটা অবধি কোত্থেকে এল সে ভাবতে ভাবতে আমি সোজা বাড়ির পথে। উচ্চিংড়েটির পানে তাকাইনি আর। তার মনে যে এখন সৌরভ গাঙ্গুলি জামা খুলে ওড়াচ্ছে সে কথা আমি তার বাপ হয়ে বিলক্ষণ জানি।

ছেলেকে (আর উচ্চিংড়ে বলছি না) বাড়ি পাঠিয়ে আমি পাড়ার চায়ের দোকানে। প্রায় চার ভাঁড় চা এবং ঘন্টা খানেকের বেশি ভাববার পরেও মাথা যথারীতি ভোঁ ভোঁ। উপায় তখন একটাই — সিধুবাবুর দোকান। না মশাই····· আমি মদ্যপান করি না। জীবনে যখন খুব ফ্রাস্ট্রেটেড লাগে তখন আমার একটাই ওষুধ — সিধুবাবু অর্থাৎ আমাদের পাড়ার মোড়ের বিখ্যাত মিষ্টির দোকান 'আবার খাবো' দোকানের ২০০ গ্রাম রাবড়ি। এমনিতে আমার ওটা বারণ, তবে ফ্রাস্ট্রেটেড অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে দেখেছি টনিকের কাজ দেয়। সিধুবাবুর দোকানে তাই আমার 'গোপন অভিসার'। সিধুবাবু লোকটি বেশ অমায়িক। দেখা হলেই একগাল হেসে আলাপ করেন। আজও সেটাই করলেন আর শুধলেন - 'কি সরকারদা, অফিস ছুটি নাকি?' আমি ঘাড় বেঁকিয়ে প্রত্যুত্তরে একটা হালকা হাসি দিয়ে দোকানের ছেলেটাকে ২০০ গ্রাম রাবড়ি অর্ডার দিতেই দ্বিতীয় বাউন্সারটা হেলমেটে খেলাম। এবার 'বোলারের' নাম — শ্রী সদানন্দ দত্ত ওরফে সিধুবাবু।

'আপনাকে রাবড়ি তো দেওয়া যাবে না সরকারদা। আপনার ডেটা বলছে গত মাসে আপনার সুগার ছিল ২৭৭। আর এই একমাসে আপনি আমার এই দোকান থেকেই তিনটে রাজভোগ, প্রায় ২০০ গ্রাম ছানার পোলাও, দুটো তালশাঁস সন্দেশ আর ১০০ গ্রাম বোঁদে খেয়েছেন। এই সপ্তাহে আপনার ডঃ সেনের কাছে যাওয়ার কথা থাকলেও যাননি। ইমিডিয়েট ডাক্তার দেখান — ব্লাড টেস্ট করান — যদি ব্লাড সুগার ১০০ র তলায় থাকে তবেই আপনি রাবড়ি পাবেন। নচেৎ নয়। আর অন্য মিষ্টির কথাও ভুলে যান।'

সিধুবাবুর কথা তখনও শেষ হয়নি। আমার 'পান্তুয়া' মার্কা মুখশ্রী দেখে নিজেই বললেন — 'আমায় মাপ করবেন। এই দেখুন —'

সিধুবাবুর মোবাইলে যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষু চড়ক গাছ। খুব সহজ কথায় বলতে গেলে আমার নামের একটি ওয়েব পেজ। আর তাতে বয়স অনুযায়ী আমার ঠিকুজি কুষ্ঠির হরেক বিবরণ - স্কুল, কলেজ, টিউশানি, চাকরী থেকে শুরু করে গতমাসে নেওয়া কেবল এর নতুন কানেকশন অবধি। হিসেব করে দেখলাম আমার স্কুলে ভর্তি হওয়ার দিন থেকে গত পরশু অবধি ছবি সহ ডেটাবেস - ট্যাব-১: এডুকেশন; ট্যাব-২: জবস; ট্যাব-৩: ফ্যামিলি; ট্যাব-৪: ফিনান্স; ট্যাব-৫: হেলথ; ট্যাব-৬: মাইন্ড; ট্যাব-৭: লোকেশন; ট্যাব-৮: আদারস। সিধুবাবুর মোবাইলে কেবল ট্যাব-৫ টি খোলা বাকিগুলি পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড।

সিধুবাবু আমার মনের অবস্থা বুঝে নিজেই বললেন - 'আমি এটার

ব্যাপারে কিছুই জানি না মশাই। আপনি দোকানে ঢোকা মাত্রই আমার মোবাইল স্ক্রিনে এইটা দেখাতে শুরু করে। সঙ্গে এই ক্যাশ ব্যাক অফার - 'You are requested not to sell any products to Mr. Joyram Sarkar. You will get Rs. 500/- for your kind gesture or else Rs. 500/- will be deducted from your Bank A/C No. XXXXXXX8967. Choose your option from the below.'

আমার আর বলার মত কিছু ছিল না। আমি রাবড়ি না খেলে কে তার নিজের পকেট থেকে ৫০০/- টাকা সিধুবাবুকে দেবে সেটা ভাবতে ভাবতেই দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। 'ছেলের স্কুলেও কি তাহলে এই ভাবেই……?'
— ভাবনাটা অসম্পূর্ণ থেকে গেল কারণ আমার মোবাইল তখন জানান দিয়েছে একটি নতুন মেসেজের। আর সে মেসেজ আমাকে জানান দিল 'Rs. 500/- is transferred from your Bank A/C No XXXXXXX0204 to the A/C XXXXXXX8967 of Sadananda Dutta for your falsehood gesture.'

বুড়ো আঙুলের প্রসঙ্গে ফিরি। আমার জীবনের এই 'বুড়ো আঙুল' অবস্থা আপনি যে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন সে আর কি আমার জানতে বাকি আছে! গাঁজাখুরি গপ্পো ভেবে উড়িয়ে দেওয়ার আগে একটু দাঁড়ান। আগামীকাল আমার জায়গায় যে আপনি থাকবেন না সে গ্যারান্টি আপনি দিতে পারেন কি? কারণ — আপনারও তো বুড়ো আঙুল আছে। কারণ — আপনিও তো শ্যামবাজার মেটিয়াবুরুজ মিনিবাসে ওঠেন — এবং সামনের ভদ্রমহিলার ব্যাগের গুঁতো খেতে খেতে মোবাইল ঘাঁটেন। কারণ — সেই অবস্থায় মাসের চব্বিশ তারিখে আসা ৫০০/- টাকার ক্যাশব্যাকের অফার আপনাকেও তো সুড়সুড়ি দেয়। স্ক্রিনের একগুচ্ছ ইংরেজিকে স্রেফ হেলায় উড়িয়ে আপনিও যে আপনার 'বুড়ো আঙুল' দিয়ে স্ক্রিনের 'Accept' বোতামটি টিপবেন না, সে গ্যারান্টি আপনি দিতে পারবেন কি না জানিনা — তবে আমি পারিনি। আমার 'বুড়ো আঙুলের' ওপর আমার কন্ট্রোল বরাবরই কম। সবশেষে একটা 'কংগ্রাচুলেশন' মার্কা মেসেজ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেমালুম ভুলে মেরেছিলুম জীবনের ঐ এপিসোডটিকে।

তবে সিধুবাবুর ফোনের ঐ ৫০০/- টাকার ক্যাশব্যাকের অফারটা দেখেই ধাঁ করে মনে পড়ল। পুরনো মেসেজ ঘেঁটে, একগুচ্ছ ইংরেজি শব্দের মায়াজাল পেরিয়ে যা বুঝলাম যে ঐ ৫০০/- টাকার লোভে আমি একটি অ্যাপকে আমার জীবনের সম্পূর্ণ কন্ট্রোল তুলে দিয়েছি - মানে স্টারটিং ফ্রম আগরপাড়ার 'রামকৃষ্ণ বিদ্যানিকেতন' টু গত পরশুর জোয়ানের আরক কেনা 'রামকৃষ্ণ ফার্মাসি'। মানে আমার 'বেসমেন্ট' টু 'চিলেকোঠা' — সম্পূর্ণ ডেটাবেস এখন তার জিম্মায়। আমার মোবাইলের ফ্রিকুএন্সিই তার ধারক ও বাহক। আমাকে একটি সম্পূর্ণ রূপে ভালো ও সুস্থ মানুষ করে তোলার জন্যে এই অ্যাপটি সর্বদা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে 'তরঙ্গ বিস্তার' থুড়ি সাহায্য করবে। এই কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সাপ্লাই দেবে আমারই ব্যাঙ্ক আকাউন্ট। এই রকম আরও হরেক কিসিমের 'টার্মস' এন্ড 'কন্ডিশন্স'। আর প্রতি সপ্তাহের শেষে আমার 'উন্নতিসাধনের' বিচারস্বরূপ আকর্ষণীয় ক্যাশ ব্যাকের অফারও আছে দেখলাম। তবে সঙ্গে একটি সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ - 'This app is now syncronized with your Aadhar Card. Hence, any attempt of deleting this app is strictly prohibited.' অ্যাপটির নামটি— 'Lie-f (লাই-ফ)' আর তাদের ট্যাগলাইনটিও চমৎকার - 'Don't Lie to your Life' সঙ্গে আবার ঐ 'বুড়ো আঙুল দেওয়া 'থাম্বস আপ' লোগো।

গতকাল রাত্রেই ভেবেছিলুম সুইসাইডের কথা…। কিন্তু… ঐ বুড়ো আঙুলটা মুখে ঢুকিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেটাই ভুলে গেছি।

রাখে হরি মারে কে

পার্থপ্রতিম ব্যানার্জী

আমাদের জীবনে প্রতি নিয়তই নানা রকম ঘটনা ঘটে, যেগুলোর অধিকাংশই আমাদের সূক্ষ্ম নজর এড়িয়ে যায়। কিন্তু খুব ভালো ভাবে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে সব ঘটনার পেছনেই যেনো কোনও অদৃশ্য শক্তির প্রভাব।

প্রতিদিনই প্রকৃতিতে নানা রকম বৈচিত্রময় ঘটনা ঘটে চলেছে, যেনো সবই পূর্বনির্ধারিত। আমরা ভাবি সবই চলছে কালের নিয়ম অনুযায়ী। কিন্তু সাধকরা বলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া যেনো গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নড়ে না। তাই মনে হয় পৃথিবীর এই সমগ্র জীবকুলের সৃষ্টি, তাদের কার্য কলাপ , তাদের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকর্তা সব যেনো সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দিয়েছেন এবং আমাদের জীবকুলকে এই পৃথিবীর আলো দেখানোর পর একে সেগুলো পরিবেশন করছেন।

আমার জীবনে যে এরকম অসখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে সেগুলো আমি মনের মধ্যে বিশ্লেষণ করতে থাকি আর ভাবি এসবই আমার পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী ঘটাই উচিৎ ছিল। শোনা গেছে রাম জন্মানোর আগেই নাকি ঋষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তাই প্রত্যেকের জীবনে ভাগ্যের চাকাটা যেনো বিধাতাই ঘোরাচ্ছেন । তাই একই ভাবে আমার জীবনের দুটো ঘটনা খুব সামান্য মনে হলেও চোখে আঙুল দিয়ে বাস্তবের সত্যতাকে প্রকট করে দিয়েছে বলে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। এতে ভগবানের হাত যে কত প্রশস্ত তার প্রমাণ দেবাই আমার আসল উদ্দেশ্য। আর সেখানেই আমদের চলতি প্রবাদ "রাখে হরি মারে কে" এটার সত্যতা।

যাইহোক, এবার আসি আসল কথায়। আমার দুটো ঘটনার একটি হলো এইরকম।

ঘটনাটা এবছর জুলাই মাসের। ঘোর বর্ষাকাল হলেও এবছর ধানবাদে তেমন বৃষ্টি নেই। মাঝে যে পড়ছে না তা নয়, তবে তা এতটাই নগণ্য যে সন্ধ্যেবেলা বেরোনোর সময় অনভ্যাসবশতঃ ছাতাটা নিতে ভুলে গেলাম। বাসস্থানে পুজোর ফুল অনেক জমে গেলে আমি সাধারণতঃ অফিস থেকে ফিরে সপরিবারে নিকটবর্তী একটা বড়ো তালাব বা দীঘির পাড়ে গাছের গোড়ায় ফুল ফেলতে যাই। দীঘিটি বাসস্থান থেকে মিনিট দশেকের হাঁটা পথ। তাই একটু সান্ধ্যভ্রমণও হয়ে যায়, এই আর কি।

যাইহোক, দীঘির পাড়ে পৌঁছে, যথারীতি গাছের গোড়ায় ফুল ফেলে, দীঘির চারপাশটা একবার ঘুরে, বাসস্থানে ফেরার জন্যে পা বাড়াবো এই ভেবে ছোট মেয়ে সাইনার হাত ধরে হেঁটে এগোতে লাগলাম। পেছনে স্ত্রী শিবানী ও বড়ো মেয়ে ফুলঝুরি পাশাপাশি হেঁটে আসছিল। হঠাৎ মনে হলো এক ফোঁটা, দু ফোঁটা হালকা ঝির ঝিরে বৃষ্টি যেনো গায়ে এসে লাগলো। আকাশ তো পরিষ্কারই ছিল। এসব ভাবতে ভাবতেই আকাশ থেকে বড়ো ফোঁটা পড়তে শুরু হলো। আশ্রয় নেবার মত তেমন কিছু চোখে পড়লো না। একদিকে বিশাল দীঘি আর অন্য দিকে ঝোপ ঝাড়ে ঘেরা ফাঁকা মাঠ। দূরে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে ভগ্নপ্রায় রং চটা রেল কোয়ার্টারস। সেও অনেকটা দূরে, অন্ধকারে ভালো করে বোঝাই যাচ্ছে না। অনতিবিলম্বে আশ্রয় না নিলে ভিজে যাবার সম্ভবনা। হঠাৎ মাঠের মাঝখানে চোখে পড়লো টিম করে একটা আলো জ্বলছে, একটু এগিয়ে যেতে বুঝলাম একটা ছোট মুদিখানার দোকান।

কাছে যেতে বুঝলাম একটা অল্পবয়েসী মেয়ে বসে দোকান চালাচ্ছে আর সঙ্গে কমার্স এর পড়াশুনা চালাচ্ছে। কথা বলে জানতে পারলাম ওরা চার বোন, এক দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, দোকান পড়াশোনা সব একসাথে চালিয়ে যেতে হয়। অনতিবিলম্বে দেখা গেলো ওর মা ছাতা নিয়ে

ওকে নিতে এলো। শিবানীর সাথে ওর মায়ের দু এক কথা অর্থাৎ বাক্যালাপ হলো। ইতিমধ্যে আশেপাশের কয়েকটা মাঝবয়সী ছেলেও এলো। সবাই দোকানের সামনের টাঙানো ত্রিপলের ভেতরে ধীরে জমায়েত হতে লাগলো। আমদের ভদ্র ব্যবহার আর সাবলীল কথাবার্তায় সবাই খুশি হলো। কিছুক্ষণ পরে দোকানী মেয়েটার মা দোকানের ঝাপ বন্ধ করিয়ে, আলো নিভিয়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেলেন । আলো নিভে যাবার পর চারিপাশে অন্ধকার যেনো আরও গাঢ় হয়ে গেল। ছেলেগুলো তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝ বয়সী ছেলে। কলেজে পড়ে । আমরা চারজন আর ওরা তিনজন। আমার সঙ্গে তিন জন মহিলা, ওরা তিন জন ছেলে। তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে, সঙ্গে প্রবল বজ্রপাত। ক্রমাগত বৃষ্টি বাড়তে লাগলো, প্রচণ্ড জোরে জলের ধারা ঝরে পড়তে লাগলো, মনে হচ্ছে যেন আকাশ ভেঙে পড়ছে, সঙ্গে আকাশ চিরে বিদ্যুতের আলোর ঝলকানি আর প্রচণ্ড বজ্রপাত। খোলামকুচির মতো ছোট্টো একটা ছাউনিতে দাঁড়িয়ে মনে হলো যেনো চারিদিকে প্রকৃতির তান্ডব চলছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা ও তার পর ছেলেগুলোর সাথে সাবলীল কথাবার্তা আর কিছুটা ভাব জমানো। মাথার মধ্যে নানান কুচিন্তা ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। প্রতিদিন সংবাদপত্রে যা পড়ছি, সুযোগ পেলে কেউ যেনো কাউকে ছাড়ছে না।

আমাদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলো যে আমরা দীঘির পাড়েফুলফেলতে এসে বৃষ্টিতে আটকে পড়েছি। সময়ের এক একটা মুহূর্ত যেনো মনে হতে লাগল এক ঘন্টার মতো। প্রকৃতির তান্ডব যে কতটা বিশাল হতে পারে সেটা বোধ হয় আমরা ঘরে বসে বুঝতে পারি না। আমরা তখনও দোকানের শেডের তলায়। চারিদিকে গাছপালা, জঙ্গল আর একটু দূরে রেল বসতি। মনে পড়লো একটা টোটো বৃষ্টি শুরুর সময় আমাদের সামনে কয়েকটা পাক মেরে রেল বসতির নীচে একটা গ্যারাজে পার্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু তখন আমরা সেটার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিনি, কারণ তখনও প্রকৃতির তান্ডব শুরু হয়নি।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ছেলে তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। ধনবাদে এতো তীব্র বৃষ্টি দেখা যায় না। মাঝে ঝলসে উঠছে বিদ্যুতের আলো। পলিথিনের শেড মাঠে মাঝখানে আর কত ধকল সইবে ! ফুটো দিয়ে চুঁইয়ে জল পড়া শুরু হয়ে গেল। তালাবে সাপখোপেরও আড্ডা কম নেই, সেটা এর আগে বার কয়েক দীঘির পাড়ে ফুল ফেলতে এসে অনুধাবন করেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না আর কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে !

ভগবান মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন মানুষেরই মাধ্যমে। "রাখে হরি মারে কে!" হঠাৎ ছেলে তিনটে যেনো সক্রিয় হয়ে উঠলো । ওদের মধ্যে একজন পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কাকে যেন ফোন করলো । অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলাম ও ফোন করেছে ওর toto ওয়ালা বন্ধুকে, যে কিছুক্ষণ আগে আমাদের সামনে দিয়ে বারকয়েক পাক খেয়ে TOTO টাকে ইতিমধ্যেই গ্যারাজে করে দিয়েছে।

ব্যক্তিটি ফোন পেয়ে কালবিলম্ব না করে গ্যারাজে থেকে TOTO বের করে সেটা ভালো করে চারপাশটা পলিথিন দিয়ে মুড়ে আমাদের শেডের সামনে এসে দাঁড়ালো। দেখে তো চমকে গেলাম। এত মেঘ না চাইতেই জল ! ছেলেগুলোকে যে কিভাবে ধণ্যবাদ জানাবো তার ভাষা খুঁজে পেলাম না।

যাইহোক, ওদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ও ওদের সাথে করমর্দন করে TOTO তে চেপে বসলাম।

এই দিনটার কথা অনেকদিন মনে থাকবে।

TOTO ওয়ালা ছেলেটির নাম জিজ্ঞেস করে জানলাম দীপক। ও

TOTO চালালেও ওর বউ রেলে চাকরী করেন। সেই সূত্রে রেল কোয়ার্টারসে বসবাস। যে ফোন করে ওকে খবর দিয়েছিলো সে ওর কলেজের বন্ধু। ওর নাম সন্দীপ। খুব পরোপকারী ছেলে। ওরা এক পাড়াতেই থাকে। দীপকের কাছে যখন সন্দীপের ফোন আসে তখন ও TOTO গ্যারাজ করে সবে চান করতে যাচ্ছিলো। হঠাৎ ফোন পেয়ে আর আমাদের বিপদের কথা শুনে কালবিলম্ব না করে TOTO আবার বের করে। এই সব কথা বার্তা চলছে তখনও TOTO র বাইরে চলছে অজস্র বারিধারা। বিদ্যুতের ঝলকানি মনে হয় একটু কমে এসেছে। আমরা কথা বলতে পৌঁছে গেলাম আমাদের বাসস্থান সিটি সেন্টারে । ওকে অশেষ ধণ্যবাদ জানিয়ে, ওকে খুশীতে ডগমগ হয়ে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে দিলাম ও contact number টা রেখে দিলাম। এরকম উপকারী বন্ধুর কথা কোনোদিনও ভুলবো না। অবিশ্বাস্য সংযোগ ! ভগবান মানুষকে কিভাবে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তার চাক্ষুষ উদাহরন এদিন প্রত্যক্ষ করলাম ! শুধু আমি নই, পরিবারের সমস্ত সদস্য নিজের চোখে দেখল ভগবানের কার্যকারিতা। তৎক্ষণাৎ কোলকাতায় ফোন করে বাপি মাকে জানলাম আমাদের নির্ঘাত বিপদের মুখ থেকে ফিরে আসার কাহিনী । মাও সমস্বরে সায় দিলেন "রাখে হরি মারে কে!"

এবার আসি আমার দ্বিতীয় ঘটনাটিতে।

আমরা একবার রাজগীরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বৌদ্ধ গয়া, নালন্দা, রাজগীর ঘুরে আমদের ধানবাদের বাসস্থানে ফেরার কথা ছিলো। কিন্তু eleventh hours এ টিকিট কাটায় রাজগির থেকে ধনবাদ direct ট্রেনের টিকিট পাওয়া গেলো না। ঠিক করলাম online গাড়ি বুক করে রাজগীর থেকে ধানবাদ যাবো। তাই make my trip এর একটি গাড়ি বুক করেছিলাম। কিন্তু নির্ধারিত দিনে গাড়ি এলো অনেক দেরি করে।

এদিকে রাজগিরে বাৎসরিক মেলা চলায় high security protection এ পুরো শহরটা ঘিরে ফেলা হয়েছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। ফলস্বরূপ আমাদের ভাড়া করা innova গাড়িটা নিয়ে শহর পেরিয়ে high way তে উঠতে বেশ সময় নষ্ট হয়ে গেলো।

বহু দিকে ঘোরাঘুরির পর প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে একটা রাস্তা বেরলো, আর মনে হ'ল গাড়িটি কোনো highway বা approach road ধরেছে। সেই রাস্তা ধরে ডানদিকে কিছুটা এগোনোর পর সেটি একটি সংকীর্ণ গলি বা বাজার জাতীয় এলাকায় এসে পড়লো । আবার একে-ওকে জিগ্যেস করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টো দিকে চলতে লাগলো। কোন marking নেই, রাস্তা জনশূন্য, দু-একটি লোককে যদিও বা দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারাও সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারছে না। এমন অবস্থায় গাড়ির একটা tire (টায়ার) leak হয়ে গেল এবং stepni থাকা সত্ত্বেও অন্ধকার গ্রামের রাস্তায় সেটা change করাও বেশ challenging মনে হ'ল। Mobile এর torch জ্বালিয়ে চেষ্টা চালালো, কিন্তু করা গেল না। আস্তে গাড়ি চালিয়ে কোনো গাড়ির গ্যারেজের সন্ধানে এগিয়ে চললো। ততক্ষণে আমি Google map খুলে ফেলেছি। রাস্তারও idea করে ফেলেছি।

রাস্তায় দু-একজনের help নিয়ে একটা সাম্ভাব্য রাস্তার সন্ধান পাওয়া গেল এবং নিকটবর্তী একটি garage এরও সন্ধান পাওয়া গেল। গাড়িটার টায়ার repairing হ'ল। কেটে গেল আরো দুঘন্টা। রাত হয়ে আসছে। তেমন কিছু খাওয়া দাওয়াও হয়নি। বার দুয়েক MakeMyTrip এর help line এ কথা বললাম এবং পরিস্থিতির explanation দিলাম। ওরা driver এর সাথে কথা বলে একটা tentative রাস্তা দেখালো। ওদেরও remote থেকে তেমন কিছু guide করার উপায় ছিল না। এদিকে রাতও বাড়তে থাকলো।

যাইহোক এরপর টায়ার সারিয়ে

নিয়ে Innova এগিয়ে চললো। বনজঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ী রাস্তা, অসংখ্য turning, Truck দুর্ঘটনার এদিক ওদিক evidence। খাদের নিচের দিকে ঢলে পড়েছে বা ঝুঁকে রয়েছে। আমাদের driver টা খুব expert ছিল। আমাদের ঘুম এসে গেলেও ও অনবরত tobacco চিবিয়ে nurve কে strong রেখে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলল। একসময় বুঝলাম বিহার থেকে ঝাড়খণ্ডে প্রবেশ করেছি।

দেখতে গাড়ি কোলকাতা-দিল্লী National Highway (NH) ধরলো, যার পূর্বতন নাম Grand Trunk Road (G. T. Road)।

সবাই তখন ঘুমে অর্ধ অচেতন। কারোর পেটে বহুক্ষণ কোনো খাবারের দানা টুকুও পড়েনি। রাত গভীর হায়েছ। সবাই শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে সিটের গায়ে এলিয়ে পড়েছে। কিন্তু সামনে যে কি বিপদ অপেক্ষা করছে তা কেউ জানে না।

গাড়ি NH ধরে এগোতে থাকলো। হঠাৎ এক জায়গায় লেখা “Toll Tax”. পাশে একটি ছোট্ট গুমটি। হঠাৎ কতকগুলি যুবকের গাড়ি ঘিরে ধরা। দাবি toll tax।

কোনো Boom Barrier এর চিহ্ন মাত্র নেই। বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ driver আঁচ করতে পারলো জালিয়াতির গন্ধ। ছেলে গুলোকে বললো , "ঠিক আছে, গাড়িটা side করতে দাও।" ছেলেগুলো একটু side হ'ল। ও গাড়ির কাঁচ গুলোকে প্রথমে তুলে দিয়ে ধীরে গাড়িটিকে রাস্তার ধারে নিয়ে যেতে লাগলো। তারপর হঠাৎ তীব্র speed বাড়িয়ে নিমেষের মধ্যে সেই অঞ্চল থেকে উধাও হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড ছেলেগুলির আস্ফালন শোনা গেল, "পাকড়ো, পাকড়ো।" তারপর সবকিছু গাড়ির উচ্চগতি আর driver এর বুদ্ধিমত্তার কাছে মলিন হয়ে গেল। গাড়ি নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে আবার ধানবাদের উদ্দেশ্যে চলতে লাগলো। রাত আড়াইটা নাগাদ ধানবাদ City Centre এ পৌঁছালো।

আমাদের travel schedule এর পরের দিন অর্থাৎ ১০ তারিখের পরেশনাথ ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হ'ল।

আবার একবার প্রমাণিত হলো "রাখে হরি মারে কে !"

এই দুটো ঘটনার মাধ্যমে পাঠকদের মনে হয়তো একটা প্রশ্নের উদয় হয়েছে! "রাখে হরি মারে কে!" হরি যদি রক্ষায় করেন তবে এরকম অযাচিত সমস্যার সৃষ্টি হয় কেন !?

Very good question!!!

আপনি একটু মাথা খাটালে সহজেই বুঝতে পারবেন মানুষ ভালো মন্দ সব কিছুই পায় তার কর্ম অনুযায়ী।অর্থাৎ যাকে বলে কর্মফল। কিন্তু সব কর্ম করান সেই হরি বা Supreme Lord। জন্ম, জীবন, জীবিকা, সবই মানুষের বিভিন্ন জন্ম জন্মান্তরের কর্ম ও চিন্তার ফল। ফল সঙ্গে ফলে না, তাই আমরা সেটা আঁচ করতেও পারি না। প্রতিনিয়তই আমরা নানা কাজ ও নানা চিন্তা করছি, যার ফল সুদূরপ্রসারী। তাই এক কথায় মানুষ তার বহু পূর্বে কোনো অসংলগ্ন কৃতকর্মের ফল অনুযায়ী অনভিপ্রেত অবস্থার সম্মুখীন হয়, আবার সেখান থেকে উদ্ধারও হয় স্বয়ং হরির সদিচ্ছায়। তাই আমরা যদি আমাদের কর্ম ও চিন্তাকে সংযত রেখে চলতে পারি, সর্বদা সৎ কর্ম এবং চিন্তায় আমাদের মন হয়, তবে হরিরও সাহায্য পাওয়া যায়। তাই আসুন সবাই মিলে বলি "রাখে হরি মারে কে !"

নমস্কার!!

অয়েল পেন্টিং

এণাক্ষী মিশ্র

মুম্বইয়ের বিখ্যাত জে জে কলেজ অফ্ আর্টস্ থেকে পাশ করে বেরোতে না বেরোতেই অনেক ফরমায়েস আসতে লাগলো। অবশ্য ছাত্র থাকাকালীন ও আমি কিছু কিছু ফরমায়েসী ছবি আঁকছিলাম। তাতেই আমার নামডাকটা বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। ও হো! আমার নামটাই তো বলা হয় নি। পলাশ-পলাশ লাহিড়ী। এবারে বাড়ির ষ্টোররুমে আমার আর্ট ষ্টুডিও বানাবো। ওখানে আমি আর আমার প্রাণের বন্ধু আশীষ বোরকার দুজনে মিলে ক্যানভাসে আমাদের মন পাখির ডানা মেলে দেবো ঠিক করলাম।

আশীষ বনেদি মারাঠি পরিবারের ছেলে। ওর প্রপিতামহ এবং তারও আগের সিঁড়ি ছিলেন নাগপুর থেকে কিছু দূরের সোনেগাঁওয়ের জমিদার। সেখানে ওদের প্রাচীন জমিদার বাড়ি আছে বলে শুনেছি। তবে ওখানে এখন কেউ থাকে না। জমিদারি প্রথা লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় আশীষের ঠাকুরদা সোনেগাঁও ছেড়ে মুম্বইতে এসে টেক্সটাইলের ব্যবসা শুরু করেন এবং মেরিন ড্রাইভে একটি সুদৃশ্য বাড়ি বানিয়ে থাকতে আরম্ভ করেন। এমন পরিবারের ছেলে হয়েও আশীষ কিন্তু আমাদের দাদারের সাধারণ বাড়িতেই পড়ে থাকে। আঙ্কল আন্টি আমাকেও খুব ভালোবাসেন। আমার মা ও আশীষকে খুব ভালোবাসেন। আশীষ নিজে ছবি আঁকার চাইতেও আমার সাথে থাকা, সারাক্ষণ বক বক করা, আমার মায়ের হাতের রান্না খাওয়া এবং আমার আঁকার সুখ্যাতি করা, ইত্যাদি করতেই বেশী ভালোবাসে।

একদিন আশীষ এসে বললো ওর বাবা বলেছেন তাঁর ঠাকুমা, অর্থাৎ আশীষের প্রপিতামহী মাধুরী দেবীর একটা বড় অয়েল পেন্টিং আছে ওদের সোনেগাঁওয়ের জমিদার বাড়িতে। সেটা নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধূলোবালিতে অবহেলায়। আমরা যদি ওটা পুনরুদ্ধার করি তাহলে ভালো হয়। পারিশ্রমিক হিসেবে আমাদের ষ্টুডিও তৈরীতে তিনি সাহায্য করবেন।

ছবি আনতে নাগপুর যেতে হবে আর এই বাহানায় আমাদের একটু বেড়ানোও হবে আর প্রাচীন জমিদার বাড়ি দেখার অভিজ্ঞতাও হবে ভেবেই আমাদের দুজনের মন নেচে উঠলো। ঐ বাড়িটার অনেক ছবি তুলে আনবো আর ফিরে এসে তাতে কল্পনার রঙ চড়িয়ে ভালো ভালো পেন্টিং বানাবো ভাবলাম।

ক'দিনের মধ্যেই একদিন বিকেলে আমরা সেবাগ্রাম এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম নাগপুরের উদ্দেশ্যে। মা এবং আন্টি দুজনেই অনেক খাবার দিয়ে দিয়েছিলেন সাথে। রাতে পেট ভরে খেয়েও পরদিন সকালে ব্রেকফাষ্ট করার জন্য লুচি হালুয়া রয়ে গেল। ভোর পাঁচটায় নাগপুর ষ্টেশনে পৌঁছে ষ্টেশনের রিফ্রেসমেন্ট রুমে ফ্রেশ হয়ে লুচি হালুয়ার সদ্ব্যবহার করা গেল। ষ্টেশন থেকে সোনেগাঁও যাওয়ার জন্য আঙ্কল আগেই গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম। সোনেগাঁও পৌঁছুতে ঘন্টা তিনেক লাগলো। শেষ মাইল খানেক রাস্তা বেশ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বাড়ির গেটে শেষ হয়েছে। পৌঁছুতেই বুড়োমত কেয়ার টেকার সদাশিব ছুটে এসে গেট খুলে দিল। আমরা ছবিটা নিয়ে বেরিয়ে যাব এবং ফিরতি ট্রেনে মুম্বই ফিরব, এটাই প্ল্যান করা ছিল। আমি গাড়ি থেকে নেমে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম বাড়িটার দিকে। যদিও বাড়িটা ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তাও সম্ভ্রমে আমার মাথা নিচু হয়ে এলো। দেয়াল বেয়ে জড়িয়ে আছে বটগাছের শেকড়। ছাদ থেকে সেই বটগাছ ডালপালা মেলে জানান দিচ্ছে তার উদ্ধত অস্তিত্ব। দোতলার জানালার কবাট আদ্ধেক ভেঙে ঝুলে আছে কোথাও কোথাও। বাড়ির বাগান আগাছায় ভর্তি। বাড়ির পেছনে মনে হয় শুধুই জঙ্গল। বাঁ হাতে কোনায় একটা একচালা। ওখানেই সদাশিব থাকে। মাচাতে দেখলাম লাউ, কুমড়ো, করলা ফলেছে আর কিছু জবা, নয়নতারা ইত্যাদি ফুল ফুটেছে।

আমরা বারান্দায় উঠলাম। সামনেই বসার ঘর। সদাশিব দরজা খুলে রেখেছিল আমরা আসব বলে। হলঘরে ঢুকে দেখলাম সিলিং থেকে ঝাড়বাতি ঝুলছে। তাতে মাকড়সা পরমানন্দে জাল বুনে মাছি ধরতে ব্যস্ত। পুরনো মেহগনী কাঠের আসবাবপত্রে ঘর ভর্তি আর কোনায় মস্ত একটা অকেজো গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। সবই ধূলি ধূষরিত। আশীষ বললো, আমাদের দোতলাতে যেতে হবে, লাইব্রেরী রুমে। ওখানেই রাখা আছে ছবিটা। সদাশিব লাইব্রেরীর দরজা খুলে দিতেই পুরনো বইয়ের গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারলো। দেয়ালে অনেক পেন্টিংয়ের মধ্যে আশীষের প্রপিতামহীর ছবিটিও দেখতে পেলাম।যদিও রঙ অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে, তাও বোঝা যাচ্ছে খুব সুন্দরী ছিলেন মহিলা। সদাশিবের সাহায্যে নামানো হল ছবিটা। আমরা সাথে করে কাগজ কাপড় এবং দড়ি নিয়ে এসেছিলাম। ওগুলোর সাহায্যে ছবিটাকে ভালোভাবে প্যাক করে গাড়িতে তুলে আমরা আবার নাগপুর রেলষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হলাম। ইতিমধ্যে আমি বাড়িটার অনেক ছবি ক্যামেরাবন্দী করেছিলাম। দারুণ দারুণ ছবি আঁকা যাবে।রাত ন'টার ফিরতি সেবাগ্রাম এক্সপ্রেসে আমরা ফিরব। পরদিন দুপুর বারোটা নাগাদ দাদার পৌঁছুব।

নাগপুর ষ্টেশন চত্বরে রেলের একটা কামরাকে হলদিরাম খুব সুন্দর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেস্টুরেন্ট বানিয়েছে। ওখানে আমরা পেট ভরে খেয়ে দেয়ে, নাগপুরের বিখ্যাত কমলালেবু, হলদিরাম থেকে "সন্তরা মিঠাই ", এবং সফটি আইসক্রিম নিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম। রেস্টুরেন্টের একটা জানালাকে কাউন্টার বানিয়ে রাত দুটো অব্দি সফটি আইসক্রিম বিক্রি হয়। আইসক্রিম খেতে খেতেই ট্রেন ছেড়ে দিল সময়মত।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা দুজন দুটো বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়লাম। আশীষ পরমানন্দে নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়ল। কিন্ত আমার বারবার ঘুমের ব্যাঘাত হতে লাগল কেন জানি না। আমি বরাবরই ট্রেনে ভাল ঘুমোই। আজ ব্যতিক্রম। ভাবলাম, নতুন অভিজ্ঞতার দরুন এটা হচ্ছে। যাই হোক, ঘুমোবার চেষ্টা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম ঐ বাড়িটা ঝলমল করছে। সব ঝাড়বাতি জ্বলছে। আর আশীষের প্রপিতামহী মাধুরী দেবী বাড়ির পূজা মন্দিরে পূজারত।তাঁর কপালে অর্দ্ধচন্দ্র টিপ, নাকে মুক্তোর নথ, কানে ময়ূরের নক্সার কানপাশা, হাতে বালা, চুড়ি, গলায় বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের অনেকগুলো হার ও চিক। তাঁর নাকের মুক্তোর নথটা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। দাদার পৌঁছে ছবিটা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। আশীষ বাড়ি পৌঁছে ফ্রেস হয়ে রাতে আবার আমাদের বাড়িতে চলে আসবে বললো। তারপর দুজন মিলে পেন্টিংটা পুনরুদ্ধারে মন দেব।

আমি বাড়ি পৌঁছে ইজেলে পেন্টিংটা চাপিয়ে দিয়ে স্নান খাওয়া সেরে তারপর ষ্টুডিওতে এসে বসলাম। ওটাকে পরিষ্কার করতেই আসল ছবিটা অনেকটাই ধরা পড়লো। কিন্ত আমার স্বপ্নে দেখা নথের পরিবর্তে ছবিতে একটা হীরে নাকের ওপর জ্বলজ্বল করছে। হাতের চুড়িগুলো একই হলেও বালার নক্সাটা একেবারে আলাদা। গলায় হারগুলোও অন্য। যাই হোক, আশীষ আসার আগেই আমি রঙ তুলি নিয়ে একটু একটু কাজ শুরু করলাম। কিন্ত কে যেন আমাকে অধিকার করে নিল। কেউ আমার হাতকে চালনা করছে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগলো আমার স্বপ্নে দেখা সেইসব অলঙ্কার। মুছে যেতে লাগলো ছবির অলঙ্কার গুলো। আশীষ এসে পেছন থেকে দেখে চীৎকার করে আমাকে থামাবার বৃথাই চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্ত আমি কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। মা, বাবা, আশীষ, কারো ডাক আমার কানে পৌঁছচ্ছিল না। রাত যত গভীর হতে লাগলো আমার বাহ্যিক অনুভূতি ততই লুপ্ত হয়ে আসতে লাগলো। ভোর ভোর আমার ছবি শেষ হল আমার অজান্তেই। চেতনা হারিয়ে আমি মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম।

জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমি

বিছানায় শুয়ে আছি। বিছানার পাশে মা, বাবা, আশীষ, আঙ্কল, আন্টি সবাই উদ্বিগ্ন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে। আশীষ বললো ,আমাকে থামাতে না পেরে ও আঙ্কল আন্টিকে ফোন করে আসতে বলে। আঙ্কল এসে ছবির দিকে একঝলক তাকিয়েই সবাইকে চুপ করতে বলেন। আঁকা শেষ করে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। আঙ্কল আমাকে বললেন - "তুমি যে সব অলঙ্কার গুলো এঁকেছো, ওগুলোই আমার ঠাকুমার প্রিয় অলঙ্কার, যা তিনি সবসময় পরে থাকতেন। এই পেন্টিং বানাবার আগে বাড়িতে একবার ডাকাত পড়ে এবং সব অলঙ্কারগুলো লুঠ হয়ে যায়। কোনদিনই ওগুলো উদ্ধার করা যায় নি। " আমি আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত এবং রাতের ঘটনা সব বললাম। আঙ্কল আন্টি চোখ বন্ধ করে করজোড়ে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওদের কপোল বেয়ে তখন অশ্রুর ধারা।

Football World Cup Quiz

Subhasis Pramanik

The 22nd edition of football World Cup is right around the corner and is set to be the first World Cup event to take place in the Middle East and the last to feature 32 teams.

The grand event is scheduled to be in motion from November 20 to December 18, when hosts Qatar take on Ecuador in opening game in Group A encounter at the Al Bayt Stadium.

Qatar 2022, as it named for this edition of the world cup will go down in history as to be the first-ever winter World Cup (usually takes place in mid year), and with the fewest stadiums (only 8 stadiums) to host the 64 matches since Argentina 1978 when there were 6 stadiums to host 38 matches held in that edition.

Lusail Stadium, the biggest stadium with a capacity of 80,000, will host the Final on December 18 as well as 10 other matches including the first semi-final. The other seven stadiums are Al Bayt Stadium (60,000), Al Janoub Stadium (40,000), Ahmad bin Ali Stadium (40,000),

Education City Stadium (40,000), Al Thumana Stadium (40,000), Stadium 974(40,000), Khalifa International Stadium (45,416).

As the preparation is hurtling and noise is roaring up, let's take a quick quiz from previous editions of World Cup.

1. The biggest margin of victory in a World Cup qualifying match was 31-0, played on 11 April,2001 between Australia (winning side) and which country?
2. Which player has the most appearances as a captain in World Cup finals?
3. Which player has scored a record 13 goals at a single edition of world cup?
4. Which country has lost the World Cup Final the most times?
5. Which goalkeeper hold the record for most clean sheets(10) at the World Cup Finals?
6. La'eeb is unveiled as the Official Mascot for FIFA World Cup 2022. What is the name of the first Mascot introduced in World Cup?
7. Which player has played the most minutes at the World Cup Finals?
8. In 1950 World Cup players' have their number printed on their shirt for the first time but players' name at the back of the shirt was introduced in which world cup?
9. Who scored the quickest goal at the World Cup Finals, just after 11seconds?
10. Which is the most attended match in World cup history? (official record of 173,850 spectators)

By Diganta Banik

By Anushka Pal

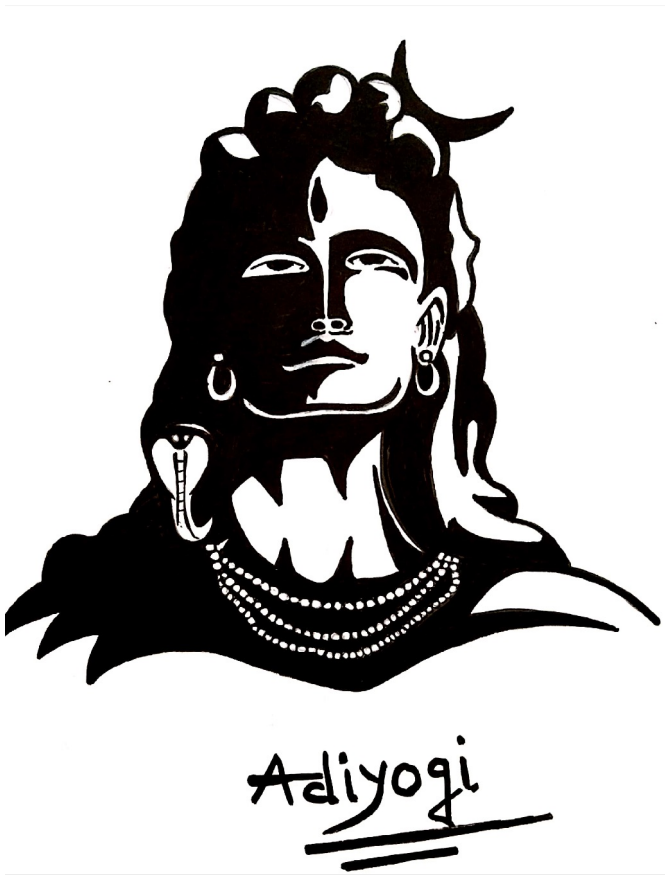

Soumi Roy

By Dishita Biswas

Recipe Section

The kitchen tussles

Tanaya Mukherjee Dasgupta

We, Bengalis always tease ourselves in one arena – that started from post-independence days. The famous tussle that stayed inside the kichen of a Bengali household, a battle between sugary and spicey dishes. The "Ghati" people make most of their dishes that tilted towards sweet taste, while "Bangal" people tend towards more spicey stuff, with loads of chilly. I come from a background that is hybrid of the two – for which I call myself "Bagh" (*tiger*) genre, taking first Bengali alphabets from "Bangal" and "Ghati". I don't like calling myself "Bati", which carries no meaning apart from its *materialistic* interpretation. However, to amalgamate the above types of cooking approaches, I was looking for a common thread, and then I found (or stumbled upon) coconut milk. I thought to use coconut milk as the rope in tug-of-war game between Hilsa fish and Prawn, the two combatants from Bangal and Ghati. Who wins? That depends, not on the recipes, but on which of the following two you cook with passion.

Narkel Ilish

Ingredients:

Onion juice
Ginger Juice
Garlic juice
Coconut milk
Turmeric
Green chilli paste
Whole garam mashala (crushed)
Salt
Sugar
Ghee and white oil
Lemon juice
and of course - Hilsha fish

Method:

Take a pan and put white oil and ghee half-and-half. Add whole garam mashala (crushed) and heat them for 1-2 minutes. Now add onion, ginger and garlic juices followed by turmeric and green chili paste. Cook until oil separates out. Then add coconut milk, sugar and salt according to your taste. Continue to cook in medium heat

for around 5-6 minutes. Add hilsa fishes*, cover and cook in low flame. Check after some time and when you see the oil starts to separate out then turn the heat off. Lastly, put a little amount of fresh lemon juice and you are done. Serve it hot of course with steamed rice.

*If the fish is bought as frozen stuff then let it come to room temperature and fry the fishes a little with salt and turmeric. Although this is should be avoided if the fish is fresh.

Bangal Prawn Malaikari:

Ingredients:

Garlic
Green Chili
Posto
Coconut milk
Turmeric
Garam mashala
Salt and Sugar
Ghee
Mustard Oil
And the obvious - Prawn

Method:

Make a paste of garlic, and green chilli. Also make a paste of posto. Fry prawns with turmeric and salt in mustard oil. After frying the prawns take the prawns out of the pan and add garlic, green chilli paste to the oil. Fry a little more and add posto paste and a little more turmeric. Fry till oil separates. Now add fried chingri and coconut milk. Cook for some time in boiling condition. Check consistency (it should be thick). Add ghee and little garam mashala and adjust salt and sugar to your taste. Garnish with green chilli. Serve hot with steamed rice.

Let me know which one you find better. Email me at: tanayaofc19@gmail.com. Cook with love, and then only the taste gives more satisfying experience. That's the only formula for the good taste. *There is no secret ingredient.*

Recipe Section

Chicken Internet

Beas Dutta

Hey, are you in the middle of reading this magazine and feeling hungry? Do you want to have some snacks? In that case I have the best snacking recipe for you all. Especially for any Kolkatan a hugely popular and delicious snack is Monginis's or Mio Amore's Chicken Internet.

My tryst with Chicken Internet:

When I was a student in Kolkata, I had a pocket money daily allowance of Rs. 5, but I craved to eat Chicken Internet of Monginis each and every day. Hence, I tried to save my money for a weekly treat of Chicken internet. Taste was unbelievable mainly because of the lure that I had to endure the whole week. Now living in Japan for 8 years me and my husband miss those delicacies from home, but one fine day we discovered the "Pie Sheet" in our local supermarket. This was an eureka moment, when we thought of reinventing by recreating the taste of chicken internet by using it.

Ingredients:

•Chicken (boneless) – 300 gms
•Pie sheet = 4 pcs in one pack
• Onion – 1 medium sized
• Tomato – 1 medium sized
• Lemon juice – ½ squeezed
• Green chilies - 2-3 pcs
• Turmeric powder – 1 tsp
•Cumin powder -1 tsp
•Coriander powder -1 tsp
• Red chili powder -1 tsp
•Chicken masala -1½ tsp
•Garam masala powder -½ tsp
•Coriander leaves if you want
•Mustard oil – 3 tbsp
•Egg – 1pc

Process:

1. First take the chicken filling in a bowl, squeeze half a lemon in it, 1 tsp salt, 1/2 tsp red chili powder mix it and keep aside.

2. On a frying pan heat 3 tbsp mustard oil and after that add 1 medium sized finely chopped onion. Fry it till pinkish-brown.
3. Then add 1 medium sized chopped tomato and stir it well till it becomes mushy.
4. Now add 1 tsp turmeric powder, 1 tsp Cumin powder, 1 tsp coriander powder, 1tsp red chili powder and sprinkle little water on top of it and stir it well ("koshano" in Bengali) till oil starts to separate.
5. Once the oil starts to separate add 1½ tsp Chicken Masala which will give the chicken keema an ultimate spice up, mix it well and then add ½ tsp garam masala powder. Give a final mix and chicken filling is done. Let it cool or can keep it in refrigerator.
6. Now take out the pie sheet packet and take 1 pie sheet fold it in half, open it then on 1 side add the chicken filling.
7. In the meantime, pre-heat the oven on 160°C for 10 mins.

Folding-

1. Now dip a finger in water and apply on the sides of the pie sheet and fold it in half. Take a fork and press it on the sides of it and a knife to make few incisions on top of the pie sheet for the perfect chicken internet look.
2. Brush egg batter on the top of every pcs of chicken internet.
3. Keep on a baking tray and bake it for 18-20 mins depending on the pie sheet on 180°C.

Voila!! the crispy Chicken internet is ready to put a bite on it.

Hey, I have a channel named *Foodiac bong*, if you like my recipe, please visit my YouTube channel and subscribe for more such recipes. Thanks in advance.

Recipe Section

肉じゃが　レシピ

若林　恵理

材料

鶏肉　スライス　400g
じゃがいも　大きめ６コ
人参　大1本
玉ねぎ　大１コ
白滝　1袋
水　400cc
醤油・酒・砂糖・みりん　各大4ずつ
ほんだし　大1

1. じゃがいもと人参は大きめの乱切りに、玉ねぎはくし切り、白滝は洗って適当に切ります。
2. 鍋に油を大２入れ強火にし、肉を入れ色が変わるまで炒めたら１も入れ軽く炒めます。
3. 煮汁の材料を入れ沸騰したら灰汁を取り白滝を入れ混ぜ中強火のまま落し蓋をし煮汁が無くなるまで約20分程煮詰めます。
4. 10分煮詰めた所で一度混ぜ、再度落し蓋をして煮汁がなくなるまで様子を見ながら更に10分位煮詰めていきます。
5. 煮汁が無くなったら火を止め落し蓋をしたまま10分間、蒸らします。味が更に染み込みます。
6. 完成。

Recipe Section

মালাই কোপ্তা

মৌসুমী বিশ্বাস

উপকরণ :

ছানা ৪০০ গ্রাম
কিশমিশ ৪ গ্রাম
কাজুবাদাম ২৫ গ্রাম
পোস্ত বাটা ২ চা চামচ
সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ
আদা বাটা ১/২ চা চামচ
রসুন বাটা ১ চামচ
পেঁয়াজ ১০০ গ্রাম
টমেটো পিউরি ১/২ কাপ
গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা চামচ
লাল লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
মাখন ২৫ গ্রাম
ক্রিম ১০০ গ্রাম
সাদাতেল পরিমাণমতো
নুন পরিমাণমতো
ধনেপাতা

প্রণালী :

ছানা পাত্রে নিয়ে ভালোকরে মাখতে হবে। কিশমিশ, কাজুবাদাম এবং ধনেপাতা মিহি কুচি করে নুন গোলমরিচ ছড়িয়ে ছানার সাথে মিশিয়ে সমানাকারের বল তৈরি করে ছানার বল গুলি বাদামি করে ভেজে নিতে হবে।

মালাইয়ের প্রণালী :

কড়াতে তেল গরম করে জিরে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি ছাড়তে হবে। পেঁয়াজে লালচে ভাব ধরলে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, নুন, ধনে পাউডার, লাল লঙ্কা পাউডার দিয়ে নাড়তে হবে। ঢাকা দিয়ে, আঁচ কমিয়ে, কিছুটা কাজু বাদাম বাটা, পোস্ত বাটা ও টমেটো পিউরি দিয়ে দিতে হবে। মশলা কষলে অল্প একটু জল দিতে হবে। ফুটলে কোপ্তা ও ক্রিম দিতে হবে। নামাবার আগে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করতে হবে।

Recipe Section

মৌরলা মাছের বাটি চচ্চড়ি

মৌসুমী বিশ্বাস

উপকরণ:

মৌরলা মাছ ২০০ গ্রাম
আলু ২টি
তেল ৩০ গ্রাম
কালো সর্ষে বাটা ৫ গ্রাম
পোস্ত ৫ গ্রাম
গোটা কাঁচা লঙ্কা ২টি
গোটা শুকনো লঙ্কা ২টি
নুন ও চিনি আন্দাজমতো
হলুদ গুঁড়ো ১/৪ চামচ
দই ২টেবিল চামচ
কাঁচা লঙ্কা বাটা ১ গ্রাম
আদা রসুন বাটা ১.৫ গ্রাম
শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো ১/৪ চামচ
জিরে গুঁড়ো
ধনে গুঁড়ো

প্রণালী:

মৌরলা মাছগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে। সোনালী বাদামি রং ধরিয়ে ভেজে নিতে হবে। কড়াতে তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে হবে। আলু সরু করে কেটে বাদামি রং ধরিয়ে ভেজে নিতে হবে। সর্ষে বাটা, পোস্ত বাটা, আদা রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, গোটা কাঁচা লঙ্কা, গোটা শুকনো লঙ্কা, নুন চিনি সব দিয়ে জল দিতে হবে। আঁচ কমিয়ে রাখতে হবে। এবার কাঁচা লঙ্কা বাটা, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে। ভাজা মাছগুলো দিয়ে নাড়তে হবে। অল্প জল দিয়ে মিনিট ৫-৬ নাড়তে হবে।

Recipe Section

পুজোর স্মৃতি আর নারকেল নাড়ু

চিত্রাঙ্গদা

আজকাল নেহাতই বয়স হয়ে গেছে, কিছু লিখতে বসলেই সবার আগে মনে আসে আমাদের ছোটবেলায় কী কী করতাম? এই যে সুদূর জাপান থেকে আবদার এলো কিছু একটা লিখো আমাদের পুজোর বইয়ের জন্যে, অমনি মনটা হুস করে পাড়ি দিল ফ্রক পরা বয়সটায়। পুজো আসছে বললেই তখন মনের মধ্যে কী হত তা খাতা কলমে লিখে ফেলার মত ক্ষমতা ঈশ্বর আমায় দেননি। তখন সবকিছুই ছিল অন্যরকম। এমনকি আকাশের নীল রঙটাও। স্কুলের ক্লাসের ফাঁকে অবাধ্য চোখ দেখে ফেলত বৃষ্টি ধোয়া নীল আকাশের মাঝে সাদা মেঘ। তার মাঝে কোন স্কুলছুট ছেলের লাটাই সুতোর টানে উড়ে বেড়াত লাল-কালো, কিংবা গোলাপি ঘুড়ি, আমি অঙ্ক বা ভূগোল ক্লাস করতে করতে সেই স্কুল পালানো ছেলেকে বড় হিংসা করতাম আর মনটা বলে উঠত ‘পুজো আসছে’। সন্ধ্যে হলে সাদা থোকা থোকা ছাতিম ফুলগুলো মন খারাপিয়া গন্ধ ছড়িয়ে দিত। তার সাথে বৃষ্টি ভেজা ঘাস মাটির সুবাস, যা কোনোদিনও বোতলে কেউ ভরতে পারে না, আমায় আবারও বলে যেত ‘পুজো আসছে’। মন ভারী করা পুজোর গন্ধের মাঝে হঠাৎ একদিন স্কুল ফেরত দেখতাম এসে পড়েছে গোছা গোছা বাঁশ, শুরু হয়ে গেছে প্যান্ডেল বাঁধা। মেঘলা বিকেলও ঝলমল করে উঠত, শিউলি গাছটা পাতা দুলিয়ে বলত 'পুজো আসছে’।

এরপর নতুন জামা, নতুন জুতো, ফুচকা, ঝালমুড়ি, ঠাকুর দেখা, নাগরদোলা, সব পেরিয়ে বলো দুগ্গা মাইকি বলে কেমন ঝপ করে ঠাকুর ভাসান হয়ে যেত টের পেতাম না। পাঁচটা দিন কোথা দিয়ে চলে যেত!! এখনও অমনি ঝপ করেই পালায় বইকি, ভালো লাগার জিনিস কবেই বা বেশিদিন থাকে? তবে ছোটবেলায় পুজোর রেশটা ধরে রাখত বিজয়া দশমীর পর্বটা। লক্ষ্মীপুজো অবধি, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্মীপুজো পার করেও বিজয়ার প্রণাম সারতে যাওয়া হত বাড়ি বাড়ি। এই বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রণাম করা আর খেয়ে আসাটা বড় মিস করি আজকাল। তখন নিয়ম করে বাড়িতে তৈরি হত হরেক রকম খাবার। আগাম জানান দিয়ে বিজয়া করতে এলে অবশ্যই থাকত ঘুগনি, কখনো কখনো তাতে পড়ত মাংসের টুকরো। আর অতিথি শব্দের অর্থ সার্থক করতে যারা হঠাৎ উপস্থিত হতেন তাদের জন্যে দোকানের সিঙ্গারা, মিষ্টি বরাদ্দ হত। আর সঙ্গে থাকত ঘরে তৈরি নাড়ু, নিমকি, চন্দ্রপুলি।

এই নাড়ু, নিমকি বানানর সময়টা আমি মায়ের পাশে ঘুর ঘুর করতাম, নারকেল করার সময় একটু নারকেল, গরম ভাজা দু চারটে নিমকি পেটে চালান দেবার জন্যে। মা বানাত গুড়ের নাড়ু, আখের গুড় জ্বাল দিয়ে

তাতে নারকেল কোরা দিয়ে পাক দিত। আঁচ না কম, না বেশি। তারপর গরম থাকতে থাকতেই হাত দিয়ে গোল গোল করে তৈরি হয়ে যেত নাড়ু। বিয়ের পর শাশুড়ি মায়ের থেকে শিখেছি চিনি দেওয়া সাদা নারকেল নাড়ু। আমার দিদাও বানাত সাদা নাড়ু, ধবধবে সাদা আর কর্পূরের গন্ধওয়ালা সেই নাড়ুর স্বাদ আজও জিভে লেগে আছে।

নারকেল কোরার সময় মায়ের হাতের চুড়ির শব্দ, দিদার বানানো কর্পূর দেওয়া নাড়ুর গন্ধ, ক্যাপ বন্দুকের আওয়াজ সব নিয়ে এখনো মনের মধ্যে এখনো কোথাও সেই ফ্রক পরা মেয়েটা 'পুজো আসছে'র অপেক্ষায় থাকে,যার মনে সেই শব্দ, গন্ধ, স্বাদ গুলো মধ্যে আলপনা এঁকে রেখেছে।

পুজোর স্মৃতির সাথে সঙ্গে রইল সাদা নারকেল নাড়ুর রেসিপি-

যা যা লাগবে-

1. নারকেল কোরা- ২ কাপ
2. চিনি-১ কাপ
3. সামান্য ছোট এলাচ গুঁড়ো বা কর্পূর

নারকেল নাড়ু বানানোর প্রণালী-

নারকেল কুরিয়ে নিতে হবে। একটি কড়াতে চিনি ও সামান্য (কয়েক চামচ) জল দিয়ে কম আঁচে চিনি গলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে। চিনি গলে গেলে কোরানো নারকেল দিতে হবে। ধিমে আঁচে ৭-৮ মিনিট পাক দিতে হবে। চাইলে অল্প মিল্কমেড দেওয়া যেতে পারে। এলাচ ব্যবহার করলে এই সময় দিয়ে দিতে হবে। একটু মিশ্রণ হাতে নিয়ে দেখতে হবে গোল পাকানো যাছে নাকি, গোল হলে গ্যাস বন্ধ করে মিশ্রণটি অল্প ঠাণ্ডা হতে দিতে হবে। হাল্কা গরম থাকতে থাকতে গোল গোল করে নাড়ু পাকাতে হবে। কর্পূর দিতে চাইলে একদম শেষে নাড়ু পাকাবার সময় দিতে হবে।

Tips for healthy eating and weight loss:

Sagarika Dey

Eating right doesn't have to be complicated. Making small changes in our regular diet can make our meals healthier. Here are 13 tips to help you in healthy eating and weight loss:

1) Slow down: Your body hormones signal to your brain whether you're hungry or full. However, it takes about 20 minutes for your brain to receive these messages. That's why eating more slowly may give your brain the time it needs to perceive that you're full. Fast eaters are much more likely to eat more than slow eaters. So, simply eating slower and chewing more often may help you eat less and thereby improve weight control.

2) Don't shop without a list: Make your shopping list ahead of time and don't go to the store hungry because hunger can cause you to toss even more low nutrient foods into your shopping cart. So having a shopping list will not only help you to buy healthier items to keep around the house, but you'll also save money.

3) Eat eggs, preferably for breakfast: Eggs are incredibly healthy, especially if you eat them in the morning. They are rich in high quality protein and many essential nutrients. Eating an egg-based breakfast reduced feelings of hunger and decreased the amount of calories consumed later in the day than a breakfast of cereal.

4) Increase your protein intake: Protein is often referred to as the king of nutrients, eating a high-protein meal decreased levels of ghrelin, the hunger hormone, more than a high-carb meal in people with obesity. If you're trying to lose weight, aim to add a source of protein to each meal and snack. It will help you feel fuller for longer, curb cravings, and make you less likely to overeat.

5) Drink enough water: Drinking enough water is important for your health. Drinking water before meals can reduce your appetite and food intake during the following meal thereby increasing weight loss and promote weight maintenance, and it may even slightly increase the number of calories you burn each day.

6) Bake or roast instead of grilling or frying: Grilling, broiling, frying, and deep-frying are all popular methods of cooking. However, during these types of cooking methods, several potentially toxic compounds are formed which have been linked to several health conditions, including cancer and heart disease. Instead cooking methods such as baking, broiling, poaching, pressure cooking, simmering, slow cooking, stewing, etc. don't promote the formation of these harmful compounds and may make your food healthier.

7) Eat your greens first: A good way to ensure that you eat your greens is to enjoy them as a starter. By doing so, you'll most likely finish all of your greens while you're at your hungriest. This may cause you to eat less of other, perhaps less healthy, components of the meal later, which could result in weight loss. Plus, eating vegetables before a carb-rich meal has been shown to have beneficial effects on blood sugar levels.

8) Eat your fruits instead of drinking them: Fruits are loaded with water, fiber, vitamins, and antioxidants. Their natural sugars are generally digested very slowly and don't cause major spikes in blood sugar levels. However, the same doesn't apply to fruit juices. Many fruit juices aren't even made from real fruit, but rather concentrate and sugar. Even real fruit juices lack the fiber and chewing resistance provided by whole fruits. This makes fruit juice much more likely to spike your blood sugar levels, leading you to consume too much in a single sitting.

9) Cook at home more often: Try to make a habit of cooking at home most nights rather than eating out. Cooking at home has been associated with a lower risk of obesity and improved diet quality, especially among children. By cooking your food yourself, you'll know exactly what is in it. You won't have to wonder about any hidden unhealthy or high calorie ingredients.

10) Become more physically active: Good nutrition and exercise often go hand in hand. Exercise has been shown to improve your mood, as well as decrease feelings of depression, anxiety, and stress. Aim to do about 30 minutes of moderate to high intensity exercise each day, or simply take the stairs and go on short walks whenever possible.

11) Stay away from "diet" foods: So-called diet foods can be very deceiving. They have usually had their fat content reduced dramatically and are often labeled "fat-free," "low fat," "fat-reduced," or "low calorie." So, many diet foods end up containing more sugar and sometimes even more calories than their full fat counterparts.

12) Get a good night's sleep: The importance of good sleep can't be overstated. Sleep deprivation disrupts appetite regulation, often leading to increased appetite. This results in increased calorie intake and weight gain. That's why it's important to try to get adequate amounts of good-quality sleep, preferably in one bout.

13) Drink your coffee black: Coffee, which is one of the most popular beverages in the world, is very healthy. In fact, it's a major source of antioxidants and has been linked to many health benefits. However, many commercial varieties of coffee contain lots of additional ingredients, such as sugar, syrup, heavy cream, and sweeteners. Instead, try drinking your coffee black or just adding a small amount of milk or cream instead of sugar.

The bottom line: Trying to incorporate some of these small changes listed above will make your diet healthier. Together, they'll have a big impact on making your overall diet healthier and more sustainable, without a huge change in your habits.

一緒に幸せになろう!

阿久津睦代

今回は３つの幸福についての紹介！
幸せを感じるには３種類あるようです。

1: セロトニン的幸福
気分が爽やかで前向き、ポジティブ、やる気がある状態。心と体が健康な状態。

2:オキシトシン的幸福
親切、ボランティア、他者貢献、感謝、つながり。

3: ドーパミン的幸福
社会的成功、お金を得る、パチンコ、アルコールでも出る、依存性のあるホルモン。

ピラミッド型をイメージして下さい。ピラミッドの土台はセロトニン。次にオキシトシン。最後がドーパミンです。

最初からドーパミン的幸福を目指してはいけません。

セロトニンは、朝散歩で出ます。
朝日を浴びて、リズム運動、朝ごはんを食べる。噛むことが大切。

オキシトシンは、人との交流、コミュニケーション、植物を育てたり、ペットとの交流で出ます。

ドーパミンはこれらを土台にして最後に、ご褒美として得られると考えた方が良さそうです。

後は自分で調べて見て下さい!
今日は簡単にヒントだけの紹介です。

インド人の皆さん、温かい雰囲気が好きです!
皆さん、ありがとうございます!

Challenges of sustaining Durga Puja at Traditional Homes in Small Towns of West Bengal

Ranit Chatterjee

Durga Puja has been named as the intangible cultural heritage by UNESCO.

In West Bengal, along with the commercial Durga puja pandals, Durga puja's at the traditional homes keep the cultural continuity of durga puja alive.

In Kolkata visiting these tradtional homes (Shovabazar Rajbari, Mallick family of Bhowanipore) to immerse in nostalgia is a part of puja tourism and at the same time support sustaining them.

But Similar tradtional homes in the small towns of West Bengal are finding it difficult to sustain in the face of rapidly changing socio-cultural norms.

I will share my experience of Durga Puja at my tradtional home in Bankura.

The puja at my ancestral house in Bankura was started by my great grandfather 79 years ago. The Durga idol is made of eight metals (oshtodhatu) and was made in Varanasi.

Months of Preparations

Ideally the puja preparations starts a few months before the actual dates.

Around June-July the contract with the priest, Dhaki (drummer) and the cook is concluded. The raising cost of living and also lucrative offers from bigger cities limits the number of good priests in Bankura.

Similarly, for Dhaki it is difficult to get someone who is willing to continue for recurringly. I have seen the number of dhakis going down from 4 when I was a child to 1 currently. Dhakis travelling to Kolkata on rooftop of buses is a common scene before sosti (6th day of Durga puja) these days. Many local pandals make up for this by playing recorded performances of dhakis.

Transition from Joint Family to Nuclear Family

Durga Puja at traditional homes is labour intensive. An army of people is needed to make arrangements, run errands and manage the whole process.

Many of these traditional homes were joint families and hence there was shared responsibilities. The shift to nuclear families has led to responsibilities being concentrated to specific household.

Migration from small town to bigger cities for (education, livelihood etc.) have resulted in people coming back to their homes during the puja vacation. In 2020 COVID outbreak in India made it difficult to travel both domestically and internationally.

Rise in cost and scarcity of resources

Like many other such tradtional home based pujas, the expenses are borne out of contribution from various family members.

Many of the resocurces essential for puja are becoming diffuclt to procure. This has led to rise in cost making thus putting extra pressure on the financials.

What I shared is possibly the reality of many other such tradational home based puajs.

The continuation of tradaitonal home based Durga puja is essential for keeping the intangible cultural heritage alive.

DURGA PUJA 2021
Statement of Collection & Expenses

Income	Amount (JPY)	Expenditure	Amount (JPY)
Member & Guest Contributions	337,500	Hall Rent	85,964
Sponsors	156,000	Food	261,500
Donations	12,115	Gifts & Raffle Draw prizes	25,281
		Puja Marketing & Other Rentals	50,753
		Transportation Charges	40,000
		Current Balance	42,117
Total Income	**505,615**	**Grand Total**	**505,615**

IBCAJ Durga Puja 2021 Balance Sheet		Credit (CR)	Debit (DR)
Member Contributions	Entry Fees	174,500	
	Donation	12,115	
Visitor Contributions	Guest payment Online	140,000	
	Paid at Counter	23,000	
Sponsors	Advertisements	156,000	
Food Expenses	Lunch + Snacks		194,000
	Dinner		67,500
Hall Expenses	Hall Rent & Equipment Usages		73,510
	COVID Related Expenses		2,454
	Purohit Charges		10,000
	Car Hire Expenses for Idol		40,000
Gift Expenses	Raffle Draw Prizes & Kids gifts		18,281
	VIP Gifts		7,000
Puja Shopping	Flowers, Utilities, Decorations		32,664
Misc	Misc		3,899
	Idol Storage Room Charges		14,190
Total Income 2021 Durga Puja		42,117	

Events of IBCAJ in last year

Bengali New year 2021

Rabindra-Nazrul Jayanti 1, 2022

DurgaPuja 2021

Rabindra-Nazrul Jayanti 2, 2022

Embassy Ekta Divas celebration

At the Indian Embassy

Events of IBCAJ in last year

Saraswati Pujo 2022

Annual General Meeting 1

15th August 2022, BBQ

Annual General Meeting 2

Member's painting exhibition at Embassy

Annual General Meeting Dinner

Outdoor camp 1

Outdoor camp 2

Current members of IBCAJ, 2022

Mr. Naba Kumar Ghosh
President

Mr. Soumya Dutta
vice-president

Mr. Mrinmoy Das
Jt Secretary

Mr. Subhasis Pramanik
Jt Secretary

Mr. Swapan Kumar Biswas
Adviser

Mr. Sanjib Chatterjee
Jt. Treasurer

Mr. Amlan Debnath

Mr. Sanjib Sanyal

Mr. Anish Dey

Dr. Suchandra Banerjee

Mr. Bhaskar Dev

Mr. Soumyadeep Mukherjee

Mr. Dipankar Biswas

Mr. Srinesh Kundu

Mr. Kaushik Paul
Outdoor Event Co-ordinator

Mr. Sugam Ghosh
Jt Treasurer

Kaustav Bhattacharyya
Magazine Co-ordinator

Mr. Subrata Pal

Mr. Kumar Sankar Roy

Mr. Amit Chakraborty

Current members of IBCAJ, 2022

Mr. Kalaswan Dutta

Mr. Punit Tyagi

Dr. Nabarun Roy

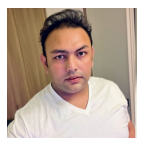
Mr. Pallab Sarkar
Media & IT co-ordinator

Mr. Arpan Das

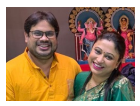
Mr. Bhaskar Dasgupta

Ms. Somdatta Banerjee

Dr. Sukanya Mishra

Dr. Prodipta Mukherjee

Dr. Rajarshi Dasgupta

Dr. Ranit Chaterjee

Ms. Jayeesha Ghosh

Dr. Rajib Shaw

Ms. Ruma Mondal

Mr. Suchhando Chaterjee

Mr. Shovan Sen

Answers to Crossword puzzle for Juniors

Across ::

1. Ape
15. Gait
23. Bovine
35. Feline
45. Leonine
56. Kennel
67. Circular
78. Artist
89. Artiste

Down ::

9. Canine
10. Sibling
11. Nibling

Answers to Crossword puzzle for Seniors

Across ::

2. Avuncular
26. Crucial
85. Win
97. Acalculia
110. Elope

Down ::

2. Accomplice
3. Vernal
4. Ululate
8. Lalochezia
10. Raraavis
12.Billetdoux
23. Acumen

Quiz answers:

1. American Samoa
2. Diego Maradona(16)
3. Just Fontaine(1958)
4. Germany(4)
5. Peter Shilton(England) & Fabien Barthez(France)
6. Willie(1966)
7. Paolo Maldini(2216mins)
8. 1994
9. Hakan Sukur
10. 1950 world Cup Final (Maracana Stadium)

Acknowledgements

インド カレー アディ

আদি ADY आदि

5F

営業時間

☎ 03.6457.9833

080.9979.7580

60分コース 3,000円/人

90分コース 3,500円/人

おつまみ, サラダ、タンドリー、カレー、
ナン、チーズナン、ご飯、デザート

食べ飲み放題 コース

intersoft
Think IT Simple

Wish IBCAJ Members & Guest a Happy & Safe Durga Puja!

We Help You To Grow

- Digital Marketing
- E-commerce
- Embedded & IoT
- Fintech
- Website
- Mobile Apps
- Medical

Intersoft Congratulates IBCAJ On Their

We are Hiring - Join Us

Send your Resume to japan.sales@intersoftkk.com

- Project Manager / Program Manager
- Service Delivery Manager
- Software Architect Engineer
- Business Development Manager
- Network Engineer / Server Engineer
- Software Developer: Java/.NET/Microsoft Dynamics CRM
- IT Recruiter
- Desk SIde Support Engineer

20+	250+	300+	20+
Years	Global Clients	Employees	Nationalities

Call us
03. 6670. 6899

Visit our website for more
www.intersoftkk.com

Mail us
sales.japan@intersoftkk.com

SARTAJ®

THE HOUSE OF QUALITY PRODUCT

Importer & Distributor of Indian spices and goods.

世界から品質の高いスパイスや食材を輸入し、販売しております。

100% vegetarian products

Sartaj Co. Ltd
株式会社サルタージ

Order Online At:
www.sartajfoods.jp

SARTAJ'S RANGE

IMPORTED BRAND RANGE

MDH · Vadilal Quick Treat · India Gate Basmati Rice · Britannia · Himalaya Since 1930 · Vatika · BVitas · Dabur Herb'l · Real Fruit Power · Denver · Mo'pleez · Mother's Recipe · Swad · DermoViva · Kitchens of India · Dabur · Khadi Natural · Shanta · Haldiram's Nagpur Taste of Tradition · Fogg · Aashirvaad

Fax: 072-751-1976 Tel: 072-751-1975 Email- info@sartajfood.jp
〒563-0043 OSAKA-FU,IKEDA-SHI,KODA 2-10-23 大阪府池田市神田2丁目10-23

ORYXPEER

About Us

MR. AJOY SINHA ROY, PRESIDENT

Mr. Sinha Roy has been associated in the business of consulting, planning, and recruiting for high-tech industries, for more than 35years.Having extensive industry experience, he adds substantial value to the customers in a different segment of the business.His experience fills the gap between the requirements. His attention, suggestion, alertness, market know-how satisfies confidence to the customers. He has been working with many of the same clients for more than 35years, which evaluate his engagement and commitment.

Our Core Domains

Web Technologies

HTML5, CSS, Bootstrap, JAVA, JavaScript, Python/Flask, C#.Net, Express Node JS Frameworks like React, Angular, Flask, Express JS, SpringBoot, Stacks : MEAN, MERN, LAMP

Mobile Technologies

Frameworks : Android, Flutter, ReactNative, Swift, Xcode

Database

MySQL, MongoDB

Cloud

AWS, GCP

Tools

GitHub, Redmine, Firebase, Docker/Kubernets

Methodologies

Agile/Scrum

Product Development

Whoovex : Virtual World Trade Fair

A unique virtual SaaS platform to bring together
Exhibitors – Businesses – Visitors

- Registration (visitor, business, exhibitors)
- Design my assets (digital showroom, exhibition)
- Promote your presence online
- Dashboard – exhibitions running, advertisements
- Virtual walkthrough of exhibition
- Visitor services
  - Download information, business cards
  - View presentations
  - Live chat with representatives
- Virtual Conferences
- Data Analytics

Launching soon...

ボンゴバザール
BongoBazar
FRESH & HALAL MARKET

BONGO BAZAR】
HALAL & SUPER MART
3-208-1 Hikonari Misato-city, Saitama.
Open Every day:10:00～20:00

No.1 TRAVEL
We go the extra mile for you
Govt Licence 2-4341

No.1 Travel is the only Travel Agency serving exclusively for EXPATS since 1990.

BETTER CONDITIONS THAN AIRLINE WEBSITE

DESTINATION KNOWLEDGE

Contact Us

Pratap Sur
080-4142-4742
Hindi, Bengali, English

Contact Us

Sunny
070-1798-5554
Hindi, Punjabi, English

AVAILABLE– Whatsapp, Viber, Line

Kanawa Bldg 2F, 7-52-6 Nishikamata Ota-ku Tokyo | no1shb@alles.or.jp | Tel: 03-6424-5031

IBCA
JAPAN

আগমনী 2022

Website: www.ibcaj.org
Email: info@ibcaj.org
Facebook: https://facebook.com/ibcaj

Publisher: India (Bengal) Cultural Association Japan